ডিসেম্বর ২০১৬ ■ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৩

সচিত্র বাংলাদেশ

বিজয়ের ৪৫ বছর

বাংলাদেশের যত অর্জন

সচিত্র বাংলাদেশ

পড়ুন ও লেখা পাঠান

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠাতে হবে
email : dfpsb@yahoo.com

- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করবেন।
- বছরের যেকোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া চলে। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি. যোগে পাঠানো হয়, এ জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% টাকা হারে দেওয়া হয়।
- এজেন্ট, গ্রাহক নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা।

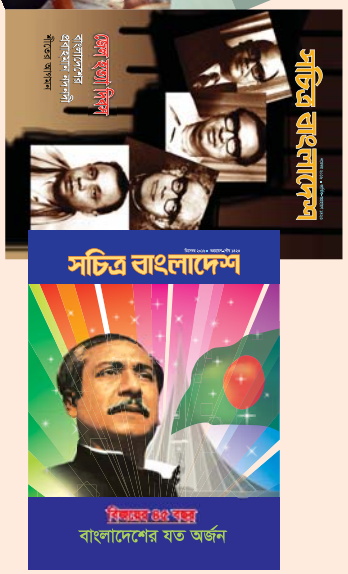

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ : dfpsb@yahoo.com ▪ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ▪ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

ডিসেম্বর ২০১৬ ■ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৩

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে সর্বস্তরের জনগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি

সম্পাদকীয়

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। দিবসটি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের কাছে গৌরবের ও আনন্দের। দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের এই দিনে বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড়ো অর্জন মহান স্বাধীনতা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া লাখো বাঙালি নরনারীর আত্মত্যাগের বিনিময়ে সেদিন বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়েছিল। বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছিল স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। বিজয়ের এই মাসে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

বিজয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার জন্য পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরগণ নীলনকশা অনুযায়ী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। আমরা শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করছি গভীর শ্রদ্ধায় ।

স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যদিয়ে আমরা ভৌগোলিক সীমানা পেয়েছি। কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমাদের গত ৪৫ বছর ধরে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে এগিয়ে চলছে।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সচিত্র বাংলাদেশ-এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হলো। এবারের সচিত্র বাংলাদেশে স্থান পেয়েছে মহান বিজয় দিবস এবং মুক্তিযুদ্ধের নিবন্ধ, প্রবন্ধ, ধারাবাহিক উপন্যাস ও গল্পসহ নিয়মিত বিষয়। আশা করি সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান

সিনিয়র সম্পাদক
শিবপদ মণ্ডল

সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
সুফিয়া বেগম

শিল্প নির্দেশক
মোস্তফা কামাল ভূইয়া

সহকারী শিল্প নির্দেশক
গনেশ চন্দ্র দেবনাথ

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

কপি রাইটার
মিতা খান

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন
সুবর্ণা শীল
নাহ্‌রীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৯৩৩৩১২০,
৯৩৩৩১৪৯, ৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র

বিজয়ের ৪৫ বছর
বাংলাদেশের যত অর্জন ৪
মাহবুব রেজা

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ
কনসার্ট ফর বাংলাদেশ ১০
খালেক বিন জয়েনউদদীন

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মিত্ররা ১৫
শামসুজ্জামান শামস

বুদ্ধিজীবী দিবস
ছড়িয়ে পড়ুক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ১৯
রোকেয়া আক্তার

মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা ২২
বাকী বিল্লাহ

গবেষকের দৃষ্টিতে
৬ দফার ৫০ বছর ২৫
সোহরাব হাসান

বিশ্বমানবতার মহান বন্ধু ২৭
শাফিকুর রাহী

বাংলাদেশের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ ২৯
বীরেন মুখার্জী

গল্প

বাড়ি ফেরার অপেক্ষা ৩৩-৩৬
কনক চৌধুরী

কবিতাগুচ্ছ ৩৭-৩৯

নির্মলেন্দু গুণ, মোহাম্মদ সাদিক, জুননু রাইন, সুধীর কৈবর্ত, মোশাররফ হোসেন ভূঞা, সোহরাব পাশা, জাকির হোসেন চৌধুরী, লিলি হক, সাদিয়া সুলতানা, বোরহান মাসুদ, তারাপদ দাস, শারমিন সাথী

ধারাবাহিক উপন্যাস

ভ্রষ্ট বিলাস ৪০-৪১
সাগরিকা নাসরিন

লিট ফেস্ট ঢাকা-২০১৬ ৪২
সাইয়েদা ফাতিমা

মহান বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো ৪৫
সুফিয়া বেগম

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি	৪৬
প্রধানমন্ত্রী	৪৬
তথ্যমন্ত্রী	৪৮
আমাদের স্বাধীনতা	৪৮
জাতীয় ঘটনা	৪৯
উন্নয়ন	৫১
নারী	৫১
শিক্ষা	৫২
প্রতিবন্ধী	৫৩
জেন্ডার	৫৪
স্বাস্থ্যকথা	৫৫
সংস্কৃতি	৫৫
ডিজিটাল বাংলাদেশ	৫৬
কৃষি	৫৭
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	৫৭
যোগাযোগ	৫৮
ইতিহাস ও ঐতিহ্য	৫৮
পরিবেশ ও জলবায়ু	৫৯
চলচ্চিত্র	৬০
সামাজিক নিরাপত্তা	৬১
নিরাপদ সড়ক	৬১
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন	৬২
শিল্প-বাণিজ্য	৬২
আন্তর্জাতিক	৬৩
ক্রীড়া	৬৪

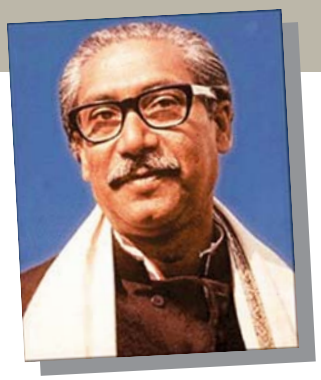

বিজয়ের ৪৫ বছর

বাংলাদেশের যত অর্জন

বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা পিতার দেখানো পথ ধরে রাজনীতির কঠিন পথে পা রাখলেন এবং দেশের প্রাচীনতম দল আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর পদ নিয়ে দেশে ফিরলেন ১৯৮১ সালের ১৭ মে। সেই থেকে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করল গণতন্ত্রের এক নতুন অভিযাত্রায়। বিজয়ের ৪৫ বছরে বাংলাদেশের যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবার কথা ছিল ইতোমধ্যেই তা সম্ভব হয়েছে, যার একক কৃতিত্ব শেখ হাসিনার একার। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৪

বুদ্ধিজীবী দিবস

ছড়িয়ে পড়ুক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে

দেশকে নতুন চিন্তার, শুদ্ধ চেতনার, মননশীলতার বিকাশ ও স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার পথ দেখান বুদ্ধিজীবীগণ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সেই বাঙালি বুদ্ধিজীবী নিধনের বিষয়টিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিতে শুরু করে পাকিস্তানিরা। তারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ধরে ধরে নির্মমভাবে হত্যা করে। এমন কি '৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে বিজয় লাভের পরেও বুদ্ধিজীবীদের নিধন অব্যাহত থাকে। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-১৯

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: dfpsb@yahoo.com

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩১৭৩৮৪

মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা

মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারীরা অন্যতম ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বত্রই নারীদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে পাকিস্তানি

হানাদারবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ থেকে শুরু করে সম্মুখযুদ্ধ পর্যন্ত সবই করেছেন। দেখুন, পৃষ্ঠা-২২

লিট ফেস্ট ঢাকা-২০১৬

নাইপল জানালেন, ঢাকায় এসে আমি আনন্দিত। কিছুটা রসিকতা করে বলেন, একবার এক অনুষ্ঠানে তাড়াতাড়ি করে ফিতা কাটছিলাম। তখন পাশে থাকা আমার এক বন্ধু বলল, ফিতা ধীরে ধীরে কাটতে হয়। আবেদনটা ধরে রাখতে হয়। আমি বোধ হয় এবারো তাড়াতাড়ি ফিতা কেটে ফেলেছি। ফিতাতো কাটলাম, এখন আমার হয়ে কেউ বক্তৃতাটা দিক। মিলনায়তন ভর্তি দর্শকশ্রোতা উপভোগ করেন নাইপলের উপস্থিতি।

দেখুন, পৃষ্ঠা-৪২

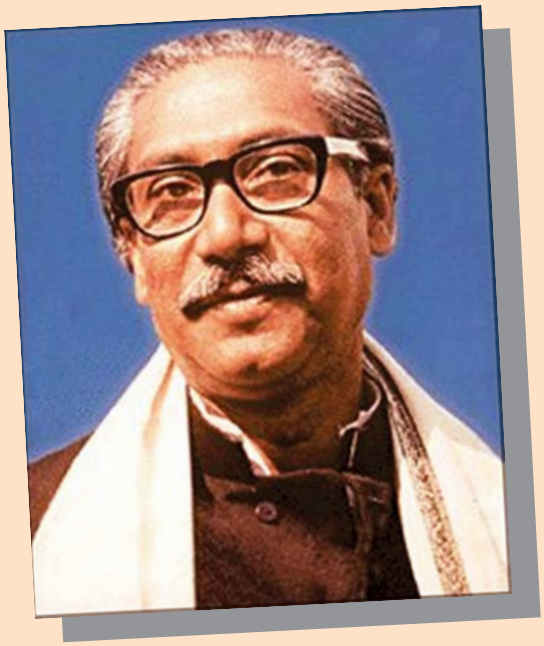

বিজয়ের ৪৫ বছর

বাংলাদেশের যত অর্জন

মাহবুব রেজা

ইতিহাস আমাদের সাক্ষ্য দেয়, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল মীর জাফরের বেইমানির ফলে। বেইমানির সেই দুঃসহ যন্ত্রণা বাঙালিকে ভোগ করতে হয়েছিল দীর্ঘদিন। অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন আর বঞ্চনার দীর্ঘ পথ পেরিয়ে বাঙালির জীবনে আবির্ভূত হয়েছিল এক মহামানবের। এই মহামানবের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ইতিহাসবিদরা তাদের তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বলছেন, বাঙালির জীবনে এই মহামানব বঙ্গবন্ধুর আবির্ভাব না হলে বাঙালি জাতিকে আজও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে হতো। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাঙালি জাতি কি আদৌ মুক্তির স্বাদ পেত, তা নিয়েও ইতিহাসবিদরা শংকা প্রকাশ করেছেন।

বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের গণআন্দোলন, সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয়, সর্বোপরি সাতই মার্চে রেসকোর্সে লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে বাঙালি জাতিকে একক নির্দেশে ঐক্যবদ্ধ ভাবে বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ এবং তারই ফলশ্রুতিতে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বুকের রক্তে বাঙালি বিশ্ব মানচিত্রে লাল-সবুজের পতাকা তুলে ধরেছে- এসব কিছুই সম্ভব হয়েছিল স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একক নেতৃত্বে। বঙ্গবন্ধুর অমোঘ বাণী একাত্তরের নয় মাস সাত কোটি বাঙালি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। যুদ্ধদিনে বঙ্গবন্ধুই হয়ে উঠেছিলেন প্রতিটি বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। বঙ্গবন্ধু মানে স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধু মানে স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু মানে বাঙালি স্বত্বা। বঙ্গবন্ধু মানে অসাম্প্রদায়িক চেতনা। বঙ্গবন্ধু মানে মুক্ত আকাশ, বুক ভরে নেওয়া দীর্ঘশ্বাস।

বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় (প্রায় এগারো বছর) কারাগারে কাটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন, 'আমি বিশাল, আমি আমাতে ব্যাপককে ধারণ করি'। বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন রচনায় দেখা যায় তিনি তাঁর স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা পূরণে রবীন্দ্রনাথের কাছে নানাভাবে ঋণ স্বীকার করেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে। বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর জীবনাচরণে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বঙ্গবন্ধু আমি'র মধ্যে না থেকে তাঁর আমিত্বকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের বুকের ভেতর, যেটা রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করতে পেরেছিলেন। বঙ্গবন্ধু রবিন্দ্রনাথের সেই আদর্শকে নিজ জীবনে কাজে লাগিয়েছেন। কবিগুরু যেমন তাঁর নিজের মধ্যে তাঁর ব্যাপকতাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, ছড়িয়ে দিয়েছেন চারদিকে, তেমনি বঙ্গবন্ধুও একই কাজ করেছেন। তিনি তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন। বঙ্গবন্ধু জেলে ছিলেন এগারো বছর। জেলের ভেতর সময় কাটত তাঁর লেখাপড়া করে। জেলের অভ্যন্তরে তাঁর সঙ্গে কী থাকত? বঙ্গবন্ধু বলেছেন, '*সঞ্চয়িতা* সঙ্গে থাকলে আমি আর কিছুই চাই না। নাটক নয়, উপন্যাস নয়, কবিগুরুর গান ও কবিতাই আমার বেশি প্রিয়। সব মিলিয়ে এগারো বছর কাটিয়েছি জেলে। আমার সব সময়ের সঙ্গী ছিল এই *সঞ্চয়িতা*। কবিতার পর কবিতা পড়তাম আর মুখস্থ করতাম। এখনও ভুলে যাইনি। এই প্রথম মিয়ানওয়ালি জেলের নমাস *সঞ্চয়িতা* সঙ্গে ছিল না। বড়ো কষ্ট পেয়েছি। আমার একটি প্রিয় গানকেই– 'আমার সোনার বাংলা' আমি স্বাধীন দেশের জাতীয় সংগীত করেছি। আর হ্যাঁ, আমার আর একটি প্রিয় গান ডি এল রায়ের 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা'। দুটি গানই আমি কাজের ফাঁকে গুনগুন করে গেয়ে থাকি।'

দুই

দেশ স্বাধীনের পর সদ্য স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধুকে নানা প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে পা ফেলতে হয়েছে। তাঁকে একইসঙ্গে দেশীয় ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আন্তর্জাতিক চক্রান্তকেও মোকাবিলা করতে হয়েছে। এতকিছুর পরও বঙ্গবন্ধু তাঁর বাংলাদেশকে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেখানে কোনো রকমের ছাড় তিনি দেননি, কাউকে ছাড়ও দেননি। ষড়যন্ত্রকারীদের তিনি রুখতে পারেননি। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্যদিয়ে খুনি চক্র বাংলাদেশের অব্যাহত উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাকাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চাইল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা দেশের বাইরে অবস্থান করায় তাঁরা প্রাণে রক্ষা পান। ঘাতকদের বুলেট থেকে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। ৭৫ থেকে ৯০ পর্যন্ত সামরিক শাসনের দীর্ঘ ছায়ায় বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি থমকে ছিল। সামরিক শাসকদের পশ্চাদমুখী নীতি ও একের পর এক অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে, যেখান থেকে উত্তরণ খুবই কষ্টসাধ্য।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পিতার দেখানো পথ ধরে রাজনীতির

কঠিন পথে পা রাখলেন এবং দেশের প্রাচীনতম দল আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর পদ নিয়ে দেশে ফিরলেন ১৯৮১ সালের ১৭ মে। সেই থেকে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করল গণতন্ত্রের এক নতুন অভিযাত্রায়। দেশ শাসনের সুযোগ পেয়ে তিনি জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিলেন তাদের হাতে। দেশের মানুষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা, উন্নয়ন আর গণতন্ত্রের অভিযাত্রা প্রত্যক্ষ করল। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত দেশের মানুষ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে গেছে অনেকটা পথ। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার আগেই ক্ষমতার পালাবদলে দেশের মানুষ আবারও এক হযবরল অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। তবুও অনেক ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা তাঁর নেতৃত্ব প্রদর্শনে মুনসিয়ানার পরিচয় দিয়ে দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাকাকে ধারাবাহিকভাবে ধরে রাখা।

এরপর ২০০৮ সালে শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে দেশ শাসনের সুযোগ লাভ করে। আবার আসে সেই বিজয়ের ক্ষণ। বিজয়ের স্বাদকে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে দেশে শুরু করলেন সমন্বিত উন্নয়নের নানামুখি কার্যক্রম। শেখ হাসিনা বুঝতে পেরেছিলেন এদেশের সাধারণ কৃষক-শ্রমিক-প্রান্তিক মানুষের জীবন মান উন্নয়ন করা না গেলে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন আর অগ্রগতি অধরাই থেকে যাবে। শেখ হাসিনার এই বাস্তব ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত, চিন্তাভাবনা এবং কার্যকর কর্মকাণ্ডে বিশ্বসভায় বাংলাদেশ পরিণত হয় এক রোল মডেলে। এখন গণতন্ত্র, কৃষি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলা, জনশক্তি রপ্তানি, বৈদেশিক মুদ্রার রেমিটেন্স, আমদানি রপ্তানি, পোশাক শিল্প, পররাষ্ট্র নীতি, জাতিসংঘের মিশনে দেশের ভাবমূর্তি বর্ধিতকরণ, বিদ্যুৎসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সাফল্য, বিশেষ করে নারী নেতৃত্বের অভাবনীয় উৎকর্ষতায় এখন বাংলাদেশ শুধু দক্ষিণ-এশিয়া নয়, সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। এর সবই সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশ পরিচালনায় বিচক্ষণ নেতৃত্বে। শেখ হাসিনা পিতার দেখানো পথ ধরে বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছেন– বাঙালি ইচ্ছে করলে সব পারে, বাঙালিকে কোনোভাবেই দমিয়ে রাখা যায় না। সাতই মার্চ রেসকোর্সের ময়দানে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিকত ভাষণে তিনি তো পরিষ্কার ভাষায় বলেই দিয়েছিলেন, 'আমাদের কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না' মূলত বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই অগ্রযাত্রায় তিনি দেশের সর্বস্তরের মানুষকে যুক্ত করতে পারার ক্ষেত্রে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন বিশ্বে। শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বের সফলতা পেতে শুরু করেছে দেশ এবং দেশের মানুষ।

আওয়ামী লীগের শাসনামল মানে গণতন্ত্র, উন্নয়ন। ১৯৫৬ সালে যখন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেয় তখন চরম খাদ্যাভাব ছিল। জানা যায়, দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু সরকারের সাফল্য অব্যাহত গতিতে চলমান থাকে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকার তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত করেছিল দুটি ভাগে। প্রথমত: পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন এবং দ্বিতীয়ত: উন্নয়ন।

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু শুরু করেন দ্বিতীয় বিপ্লব– অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম। ৩ কোটি ছিন্নমূল মানুষ, দেড় কোটি অগ্নিদগ্ধ ঘরবাড়ি, ১ কোটি শরণার্থীর প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন সমস্যা, শূন্য খাদ্য গুদাম, অনাবাদি জমি, অচল বন্দর, ডুবন্ত নৌযান, যোগাযোগ, পরিবহণ এবং অভ্যন্তরীণ নৌ ও সমুদ্র বন্দরের অচলাবস্থা, ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো, মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধজনিত কারণে তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, স্বাধীনতা-বিরোধীদের অন্তর্ঘাত ও নাশকতামূলক তৎপরতায় বিপর্যস্ত জনজীবন এমন বিরূপ ও সংকটাকুল পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে জাতিসংঘের স্বীকৃতি অর্জনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকার যে সফলতা দেখিয়েছ বিশ্বের ইতিহাসে তা বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

তখন বিভিন্ন দেশ ও সাহায্য সংস্থা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা জরিপ করে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল যে, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে খাদ্যাভাবে ২ কোটি লোক মৃত্যুবরণ করবে। বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ৪ কোটি ৭৫ লাখ মণ খাদ্যসামগ্রী বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে বিতরণ করে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু ঠেকাতে সমর্থ হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সময়োচিত পদক্ষেপে এই ভয়াবহ সংকট মোকাবিলা বিশ্ববাসীকে অভিভূত করেছিল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও ভৈরব সেতুসহ ৫৬৭টি সেতু নির্মাণ ও মেরামত, ৭টি নতুন ফেরি, ১ হাজার ৮৫১টি রেলওয়ে ওয়াগন ও যাত্রীবাহী বগি, ৪৬টি বাস, ৬০৫টি নৌযান ও ৩টি পুরাতন বিমান চালু করে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং মাইন উদ্ধার করে অচল বন্দরসমূহ সচল করা হয়। সম্পূর্ণরূপে

১৯ মার্চ ১৯৭২, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুক্তিযোদ্ধা, ১৯৭১

দেউলিয়া ও প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বীমা ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিট জাতীয়করণ ও উৎপাদনক্ষম করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন নতুন শিল্প কলকারখানা গড়ে তোলার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস ঘোষণা করে মাত্র ৯ মাসের মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন করা হয়।

তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের ফেরত পাঠানো, পাকিস্তানে আটক প্রায় ৪ লাখ বাঙালিকে দেশে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসিত করা, ৭ লাখ পাকিস্তানিকে ফেরত পাঠানো, মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ফিরিয়ে নেওয়া, মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহিদ পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের দায়িত্ব গ্রহণ, চিকিৎসার জন্য পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেশ প্রেরণ, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন, প্রতি থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ, ১১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, ৫৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগসহ স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা নির্মাণ, সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীসহ প্রতিরক্ষাবাহিনীকে জাতীয় মর্যাদায় পুনর্গঠন, সামরিক একাডেমি স্থাপন, পুলিশ, বিডিআর, আনসার ও বেসামরিক প্রশাসনের অবকাঠামো গড়ে তোলা, প্রতিবেশী দেশের সাথে সীমান্ত ও ফারাক্কার পানি চুক্তি, জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ ও ১৪০টি দেশের স্বীকৃতি লাভের ন্যায় কারিসম্যাটিক সফলতা অর্জন বাংলার জনগণের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অপরিসীম ত্যাগের মানসিকতার ফলে সম্ভব হয়েছিল। মাত্র সাড়ে তিন বছরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকার রক্তস্নাত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শূন্য হাতে একটি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে সফলতা অর্জন করেছিল তা বিস্ময়কর ব্যাপার।

তিন

শেখ হাসিনা ১৯৯৬, ২০০৮ এবং ২০১৪ সালে তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় এসে পুরো বাংলাদেশের চিত্রকেই পালটে দিয়েছেন। বিশেষ করে দেশের সব মাধ্যমে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন। উন্নয়ন গবেষকরা বলছেন, স্বাধীনতার ৪৫ বছরে বাংলাদেশের যে অর্জন তার সিংহভাগ কৃতিত্ব আওয়ামী লীগের। সঙ্গত কারণে এর দায়ভার গিয়ে পড়ে এই দলের সভানেত্রীর ওপর। শেখ হাসিনা শত প্রতিকূলতাকে পাশ কাটিয়ে ইস্পাত কঠিন প্রত্যয় নিয়ে দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। বাংলাদেশের অর্জনকে নানা ভাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে বিভিন্ন মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্জনকে বিস্ময়কর বলে উল্লেখ করেছেন। উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা তাদের মূল্যায়নে বলছেন, ক্ষুদ্র আয়তনের একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারাবিশ্বের নিকট প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে তাঁর ভূমিকা, জনবহুল দেশে নির্বাচন পরিচালনায় স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুতা আনয়ন, বৃক্ষরোপণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে জন্ম নেওয়া এই বাংলাদেশকে আজকের অবস্থানে আসতে অতিক্রম করতে হয়েছে হাজারো প্রতিবন্ধকতা। যুদ্ধবিধ্বস্ত, প্রায় সর্বক্ষেত্রে অবকাঠামো বিহীন সেদিনের সেই সদ্যজাত জাতির ৪৫ বছরের অর্জনের পরিসংখ্যানও নিতান্ত অপ্রতুল নয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৮টি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা, শিশুমৃত্যু হার কমানো এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। নোবেল বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের করা মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বকে চমকে দেবার মতো সাফল্য আছে বাংলাদেশের। বিশেষত শিক্ষা সুবিধা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হার ও জন্মহার কমানো, গরিব মানুষের জন্য শৌচাগার ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান এবং শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম অন্যতম।

বিশ্বব্যাংক তাদের প্রতিবেদনে শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রভূত উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে উল্লেখ করেছে, শিক্ষাখাত, স্বাস্থ্যসেবায় সাফল্য, নারী ও শিশু উন্নয়নে অর্জন, নারীর ক্ষমতায়নে অর্জন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, কৃষিতে কৃতিত্ব এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, প্রবাসী শ্রমিকদের উন্নয়নে অর্জন, জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ, বিদ্যুৎখাতে সাফল্য, শিল্প ও বাণিজ্য খাতে অর্জন, সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাংলাদেশের অর্জন, ভূমি ব্যবস্থাপনায় অর্জন, মন্দা মোকাবিলায় সাফল্যসহ সব সেক্টরে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাফল্য বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে।

কুখ্যাত কালো আইন ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিলের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা এবং আমাদের সংবিধানের পবিত্রতা পুনরুদ্ধার করা হয়। দীর্ঘ ২৩ বছর পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করা হয়।

আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের মাত্র ছয় মাসের মধ্যে, ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারতের সাথে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনে ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তি সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দীর্ঘ দুই দশক ধরে বিরাজ করছিল হানাহানি ও সংঘাত। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর জননেত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে শান্তিবাহিনীর নেতা সন্তু লারমা শান্তিচুক্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরের মাধ্যমে সংঘাতের অবসান ঘোষণা করেন। ১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ির স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে শান্তিবাহিনী প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করেন। সেই সাথে ওই বাহিনীর প্রায় ২ হাজার সশস্ত্র সদস্যও গোপন অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে অস্ত্র সমর্পণ করে ফিরে যান স্বাভাবিক জীবনে। একই সময়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী প্রায় ৬৫ হাজার চাকমা শরণার্থী মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন।

১৯৯৭ সালের উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড়, ১৯৯৮ সালের শতাব্দীর প্রলয়ংকরী বন্যা এবং ২০০০ সালে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১১টি জেলায় ৫০ বছরের মধ্যে প্রথম আকস্মিক ভয়াবহ বন্যা মোকাবিলায় আওয়ামী লীগ সরকারের অভূতপূর্ব সাফল্য দেশবাসী ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের বিপুল প্রশংসা অর্জন করে। ১৯৯৮ সালে দেশের ৫৩টি জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিধ্বংসী বন্যায় ২ কোটি মানুষ না খেয়ে মারা যাবে বলে বিরোধী দল যে প্রচার করেছিল, তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সেই সময় একজন মানুষও খাদ্যের অভাবে মারা যায়নি।

শেখ হাসিনার সরকারের আমলেই দেশ সর্বপ্রথম খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছে। নির্দিষ্ট সময়ের দুই বছর আগেই খাদ্যে বিএনপি আমলের ৪০ লাখ টন ঘাটতি পূরণ করে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং ২ কোটি ৭০ লাখ মেট্রিক টনের রেকর্ড পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন আওয়ামী লীগ সরকারের একটি যুগান্তকারী সাফল্য। ২৫ লাখ মেট্রিক টন উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশবাসীর জন্য গড়ে তুলেছে একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিকাশে আন্তরিক ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, দীর্ঘ ২১ বছরের ইতিহাস বিকৃতির অবসান, নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানদানের উদ্যোগ গ্রহণ, অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে তাদের সন্তানদের জন্য চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ১০ হাজার টাকা হারে সম্মানীভাতা প্রদান, মৃত্যুর পর মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন বা সৎকার এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিখা চিরন্তন স্থাপন ও স্বাধীনতার বিজয়স্তম্ভ নির্মাণসহ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২১ বছরের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে আওয়ামী লীগ পাঁচ বছরের শাসনামলে গড়ে সর্বোচ্চ প্রায় ৬ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। মাথাপিছু আয় ২৮০ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ৩৮৬ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার কমে আসে। অনুচ্চ দারিদ্র্য সূচক বিএনপির আমলের ৪৭.২ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৩৪ শতাংশে। গড় আয়ু ৫৮.৭ থেকে ৬১.৮ বছরে উন্নীত হয়। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। স্থাপিত হয় ১ লাখ ৬ হাজার ৭৭৭টি ছোটো-বড়ো শিল্পকারখানা। এতে লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

বিশ্বের ১১তম দীর্ঘতম সেতু পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। শেখ হাসিনা সরকারের অন্যতম সাফল্য হল পদ্মা সেতু নির্মাণ। বিশ্ব ব্যাংককে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থায়নে পদ্মা সেতু তৈরি করে শেখ হাসিনা বিশ্বকে চমকে দিয়েছেন। ২০১৮ সালে পদ্মা সেতু উন্মুক্ত হয়ে গেলে তা দেশের অর্থনীতির চাকাকে আরো গতিশীল করবে। জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নে পদ্মা সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নির্মিত হয় ধলেশ্বরী ১ ও ২ নম্বর সেতু, পঞ্চগড়ে করতোয়া সেতু ও বুড়িগঙ্গা দ্বিতীয় সেতুসহ অসংখ্য ছোটো-বড়ো সেতু। এছাড়া রূপসা ব্রিজ, পাকশীতে এম মনসুর আলী সেতু ও ভৈরবের কাছে মেঘনা নদীতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু, কুড়িগ্রামে ধরলা সেতু, বরিশালে দোয়ারিক-শিকারপুর সেতুসহ আরো বড়ো বড়ো সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। নির্মিত হয়েছে মাঝারি ও ছোটো-বড়ো অসংখ্য সেতু। পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। জাপানি সহায়তায় শুরু হয়েছিল সমীক্ষার কাজ।

আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের শাসনামলে নতুন ১৫ হাজার ৯২৮ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ৩৫ হাজার ৮০২ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা ও ১৯ হাজার পুল ও কালভার্ট এবং ২ হাজার ৪০১ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বিএনপি আমলের ১৬০০ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশি অর্থাৎ, ৩৮০৩ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। গ্যাস উত্তোলন বিগত আমলের ৭০ কোটি থেকে বেড়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৩০ কোটি ঘনফুট ছাড়িয়ে যায়। টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকার

পদ্মা সেতুর মডেল

এক বিপ্লবের সূচনা করে। মোবাইল ফোনের দাম ১ লাখ থেকে ৫-৬ হাজার টাকায় নামিয়ে আনা হয়। ফলে মোবাইল টেলিফোন গ্রাহকের সংখ্যা বিগত আমলের ২১ হাজার থেকে বেড়ে আড়াই লাখ ছাড়িয়ে যায়। কম্পিউটার আমদানির ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়। একটি গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণীত হয়। শিক্ষা খাতে দেওয়া হয় সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ। দেশে এই প্রথম একটি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়, দুটি নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, দুটি নতুন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, ৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিপুল সংখ্যক নতুন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগই প্রথম দেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে দেশে প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণীত হয়। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্য একটি করে ১৮ হাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করার কাজ হাতে নেওয়া হয়।

দারিদ্র্য বিমোচন ও দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে শেখ হাসিনার সরকার দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম বয়োজ্যেষ্ঠ সমসংখ্যক (প্রতি ইউনিয়নে ৯০ জন) দুস্থ মহিলা ও পুরুষের জন্য মাসিক বয়স্কভাতা এবং বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাভাতা স্কিম চালু করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছিন্নমূল মানুষদের আবাস ও কর্মসংস্থানের জন্য গৃহীত আশ্রয়ণ প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৩৩ হাজার পরিবারের ২ লাখ মানুষ পুনর্বাসিত হয়। আদর্শ গ্রামে পুনর্বাসিত করা হয়েছে ৪৫ হাজার ছিন্নমূল পরিবারকে। এছাড়া বস্তিবাসীদের গ্রামে পুনর্বাসনের জন্য ঘরে ফেরা কর্মসূচি, অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের থাকার জন্য শান্তি নিবাস এবং গৃহায়ণ তহবিল থেকে দেশের ইতিহাসে এই প্রথম গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এছাড়া দারিদ্র্য নিরসন ও প্রতিটি বাড়িকে স্বয়ম্ভর অর্থনৈতিক ইউনিটে পরিণত করার লক্ষ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রহণ করা হয় একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই প্রথম বন্যা-ঝড়-জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় প্রতিবছর ফসল ওঠার আগে এবং প্রতি ঈদ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উৎসবের সময় লাখ লাখ দরিদ্র পরিবারকে ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে খাদ্য সাহায্য দেওয়া হয়। শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন কর্তৃক প্রণীত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরির সুপারিশ বাস্তবায়িত করা হয়। নির্বাচনি ওয়াদা অনুযায়ী একটি গণতান্ত্রিক শ্রমনীতি প্রণয়ন করা হয়। ১১টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানার মালিকানা ও পরিচালনার দায়িত্বভার সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। এই প্রথম মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিমদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে।

দেশের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে বিগত নির্বাচনে দেওয়া আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার ও কর্মসূচি দেশকে বিশ্বসভায় অধিষ্ঠিত করে এক গৌরবের আসনে। প্রতিবেশী ভারতের সাথে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদন, দুটি দেশের মধ্যে সরাসরি বাস সার্ভিস ও ট্রেন যোগাযোগ চালুসহ অন্যান্য অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানে অর্জিত হয় সাফল্য। সার্কভুক্ত অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ এবং মিয়ানমারের সাথে সৎ, প্রতিবেশীসুলভ বহুমুখী সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়।

চার

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের দ্বিতীয় দফা অর্থাৎ ২০০৮ থেকে ২০১৩-এই ৫ বছরও শেখ হাসিনা উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে আওয়ামী লীগই দেশের উন্নয়নে একটি দীর্ঘমেয়াদি সুস্পষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করে। ২০০৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত রূপকল্প ২০২১ বা ভিশন উপস্থাপন করে। ২০০৯-১৪ পাঁচ বছর মেয়াদে এই কর্মসূচি ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের অগ্রগতির কথা শুধু দেশবাসী নয়, বিশ্ববাসীও জানে যে কারণে তারা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন বিশ্ব সভায়। অর্থনীতি সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিশ্বমন্দার প্রভাব সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার পাশাপাশি বাংলাদেশে গড়ে ৬.২ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। সামষ্টিক অর্থনীতির এই চিত্র আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসা সূচক স্বীকৃতি অর্জন করে। এই পাঁচ বছরে জাতীয় বাজেটের আয়তন ২০০৬-এর তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩.৭ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। রেমিটেন্স বেড়েছে ৩.৭ গুণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫ গুণ, রপ্তানি আয় বাড়ে আড়াই গুণ। মূলস্ফীতির হার ১১ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭.৫ শতাংশে স্থিতিশীল করা হয়। এ সময়ে জনগণের আয়-রোজগার ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরে দুর্নীতি ও অনিয়মের উৎসমুখগুলো বন্ধ করার লক্ষ্যে অনলাইনে টেন্ডারসহ বিভিন্ন সেবা খাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে দুর্নীতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অর্জিত হয়েছে অভূতপূর্ব সাফল্য। ২০১৩ সালের মধ্যে ৭০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে তা ১০০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হয়। ২০২১ সালের মধ্যে ২৪০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাহায্যে ২০০০ মেগাওয়াটের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণকাজ শুরু হয়। রামপাল ও চট্টগ্রামে কয়লা ভিত্তিক আরও দুটি বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের নির্মাণকাজ শুরু হয়। এ সময়ে দেশের ৬২ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসে। নতুন নতুন গ্যাসকূপ খনন, গ্যাসক্ষেত্র এবং দুটি তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। শিল্পকারখানা এবং গৃহস্থালি কাজে নতুন গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়।

২০০৬ সালে হাইকোর্ট এবং ২০১১ সালে সুপ্রিমকোর্ট জিয়া-এরশাদের সামরিক শাসন ও সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রথম থেকেই সামরিক শাসকদের অবৈধ সংবিধান সংশোধনীর বিরোধিতা করেছে। '৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ ছিল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০১০ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকে '৭২-এর সংবিধানের মূল চেতনায় ফিরে যাওয়ার লক্ষ্যে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল সংসদে উত্থাপন করা হয়।

নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আর্থিক ক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিচার বিভাগের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে স্বতন্ত্র বেতন স্কেল।

বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম মহামান্য রাষ্ট্রপতি সব রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সার্চ কমিটির সুপারিশ

অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে লোকবল নিয়োগ ও আর্থিক ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে। পাঁচ বছরে সংসদ উপনির্বাচন, সিটি কর্পোরেশন ও মেয়র নির্বাচনসহ ৫ হাজার ৮০৩টি স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে ৬৪ হাজার ২৩ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

১ জানুয়ারি ২০১৬, গণভবনে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও ফলের পরিসংখ্যান হস্তান্তরের পর পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স দুই বছর বাড়িয়ে ৫৯ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬০ বছর। ঘোষণা করা হয়েছে ২০ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা। সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ছুটি চার মাস থেকে বাড়িয়ে ছয় মাসে উন্নীত করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার রাজস্ব খাতে ৪ লাখ ২৭ হাজারের বেশি পদ সৃষ্টি করেছে এবং ১ লাখ ১৮ হাজারের বেশি পদ স্থায়ী করেছে। চাকরিরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে ২০ হাজার টাকার স্থলে ৫ লাখ টাকা এবং আহত হলে ২ লাখ টাকা অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। বেতন, ভাতা, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ দেশের পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসমূহকে আধুনিক ও দক্ষ করে গড়ে তোলার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রংপুরে নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিভাগীয় শহর রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও গাজীপুরকে সিটি করপোরেশন ঘোষণা করে সেসব করপোরেশনের নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে। ময়মনসিংহকে সিটি করপোরেশনে উন্নীত করা হয়েছে। ২০১২ সালের মধ্যেই দেশ খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করে।

পাঁচ

উন্নয়ন গবেষকরা বলছেন, দারিদ্র্য বিমোচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারের অভূতপূর্ব সাফল্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনসহ কয়েকটি ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) নির্ধারিত ২০১৫ সালের দুই বছর আগেই অর্থাৎ, ২০১৩ সালে বাংলাদেশ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৩ সালে সাধারণ দারিদ্র্যসীমা ২৬.২ শতাংশে এবং হতদরিদ্রের হার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১১.৯ শতাংশে নেমে আসে এবং ৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে মধ্যবিত্তের স্তরে উঠে এসেছে। পাঁচ বছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয় (দেশের ভেতরে ৬৯ লাখ মানুষের এবং বিদেশে ২৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে) সৌদি আরবে আকামা পরিবর্তনের সুবাদে ৪ লক্ষাধিক কর্মী বৈধ হয়েছে।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার ২০০৮-এ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এজেণ্ডা ছিল সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রাধিকার। এই চ্যালেঞ্জেও শেখ হাসিনা সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। শেখ হাসিনা সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করার মাত্র ৫২ দিনের মাথায় সংঘটিত হয় রক্তাক্ত বিডিআর বিদ্রোহ। চরম ধৈর্য, অসীম সাহস ও রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিডিআর বিদ্রোহের শান্তিপূর্ণ সমাধান করেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকর করা হয়েছে, সম্পন্ন হয়েছে জেল হত্যার বিচার। উন্মুক্ত হয়েছে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথ। নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করে এই মেয়াদে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ১০ যুদ্ধাপরাধীর বিচার সম্পন্ন করে কার্যকর করা হয়।

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা তাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে বলেছেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর নেতৃত্বে যে 'সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন' দেখেছিলেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই পথেই হাঁটছেন যার সুফল ভোগ করছে দেশবাসী। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে আরো বলছেন, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ সবদিক দিয়ে আজ মালয়েশিয়াকেও ছাড়িয়ে যেত। তারপরও বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের দীর্ঘ একুশ বছর পর দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়ে তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনা তিন দফায় যথার্থভাবে দেশ পরিচালনা করে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন গণতন্ত্র, দেশপ্রেম আর দেশের জন্য কিছু করার ইচ্ছে থাকলে সব সম্ভব। তারা মনে করছেন, স্বাধীনতার ৪৫ বছরে বাংলাদেশের যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবার কথা ছিল ইতোমধ্যেই তা সম্ভব হয়েছে যার একক কৃতিত্ব শেখ হাসিনার একার।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

খালেক বিন জয়েনউদদীন

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জনের বিষয়, প্রতিদিনের অহংকারের বিষয়। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আজীবন সংগ্রাম ও স্বাধীনতার চূড়ান্ত পর্বে এবং তাঁরই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা পাকিস্তানি নরদস্যুদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। বিজয় অর্জন করেছিলাম। আজ থেকে ৪৫ বছর আগে নবজাতক বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল। আমাদের এ বিজয়ের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর সূর্যসন্তানেরা হলেন অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা, নির্যাতিত মা-বোন তথা ৪ হাজার বছরের স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠী।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে একবার দ্বিজাতিতত্ত্বের স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। সেই স্বাধীনতা সর্বজনীনতা পায়নি। এক বছরের মধ্যেই ভাষার প্রশ্নে পূর্ব বাংলার মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গ হয়ে গেল। শুরু হলো পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ-নির্যাতন। বায়ান্নে মাতৃভাষা রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে হলো। চুয়ান্নতে বাঙালি নির্বাচনে জিতে পূর্ব বাংলার শাসন ক্ষমতায় এবং কেন্দ্রে বেশিদিন টিকে থাকতে পারল না। সর্বক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার মানুষ তখন সর্বহারা। পঁয়ষট্টির ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পূর্ব বাংলা অরক্ষিত থাকল। এই অবস্থায় বাঙালির কণ্ডারি হয়ে আবির্ভূত হলেন গোপালগঞ্জের এক তরুণ। যিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের স্নাতক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী প্রমুখ প্রগতিশীল রাজনীতিকদের অনুসারী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিষ্কৃত ছাত্র, যার নাম শেখ মুজিবুর রহমান। প্রথমেই তিনি বাঙালির ন্যায্য অধিকার ও মুক্তির লক্ষ্যে ৬ দফা দাবি তুললেন এবং বাংলার জনগণকে বোঝালেন, বাঁচতে হলে ৬ দফা ছাড়া উপায় নেই। ৬ দফা অগ্রাহ্য হলো, উপরন্তু পাকিস্তানি শাসকবর্গ পাকিস্তান ভাঙার দায়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা রজু করে তাঁকে এবং অন্যদের জেলে ঢোকালো।

এরপর উনসত্তর। বাঙালি জেগে ওঠার কাল। গণ-অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব মুক্তি পেলেন। সামরিক শাসক আইয়ুব খান বিদায় নিল মসনদ থেকে। কিন্তু ক্ষমতায় বসল তারচেয়ে ভয়ংকর কীট ইয়াহিয়া খান। লোকটি পাকিস্তানি নির্বাচনের কথা বলে ক্ষুব্ধ বাঙালিকে শান্ত করলেন এবং নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হলো। দেখা গেল বাঙালি জিতেছে। বাঙালিকে ক্ষমতায় যেতে দেওয়া হলো না। এই লোকটি ঢাকা এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে টালবাহানার আলোচনা করলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাবার সময় লোকটি জেগে ওঠা

বিজয়ের পর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিকামী জনগণের ঢাকার উদ্দেশ্যে অব্যাহত অগ্রযাত্রা

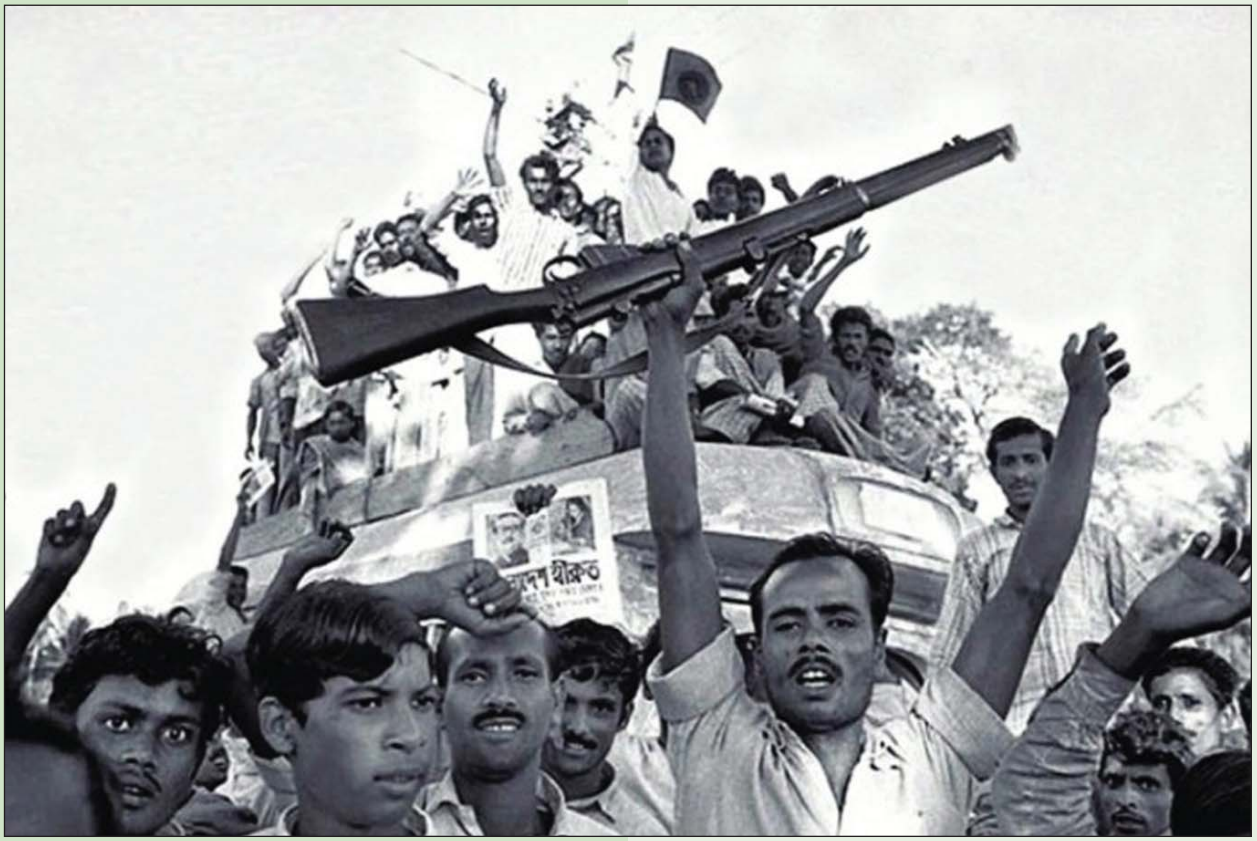

নিরস্ত্র বাঙালিকে সমূলে নিধনে নির্দেশ দিয়ে গেলেন তার শিষ্য গভর্নর টিক্কা খানকে। তখন পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ বনে গেছে। অগ্নিগর্ভ শহর-জনপদ। টিক্কা খান ২৫ মার্চ 'অপারেশন সার্চ লাইট' শুরু করল প্রথমে ঢাকায়, ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের সকল শহর ও গ্রামাঞ্চলে।

অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার মধ্যদিয়ে। বঙ্গবন্ধুও গ্রেফতারের আগে ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২ টার পর অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে ইপিআরের ওয়ারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তখন ইপিআরের ওয়ারলেসই ছিল সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার পর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আওয়ামী লীগের সংগ্রাম কমিটি, পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর পুলিশ, আনসার এবং স্বাধীনতাকামী সকল স্তরের মানুষ প্রথমে পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রতিরোধ করে পরে সংগঠিত হয়ে স্বাধীনতার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। ১০ এপ্রিলে গঠিত মুক্তিযুদ্ধের সরকার মুজিব নগরে ১৭ এপ্রিল শপথ নিলে মুক্তিযুদ্ধের অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত হয়। এসময় বাংলার চিরকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকে বাস্তবে কার্যকর করার লক্ষ্যে ভারত আমাদের পাশে দাঁড়ায়। এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয়, বাস ও খাদ্য প্রদানসহ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রদান বাঙালিকে আরো সাহসী করে তোলে। আর এসবের মূলে ছিল মিত্রমাতা ইন্দিরা গান্ধীর সহমর্মিতা। একাত্তরের সেই আগরতলা, আসাম ও পশ্চিম বাংলা মনে হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের আর একটি বাংলাদেশ। ডিসেম্বরে পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করলে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সৈন্যরা মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথ কমান্ড গঠন করে। মাত্র ১২/১৩ দিনের যুদ্ধেই পাকিস্তানি সৈন্যের খায়েশ মিটে যায়। ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করে নিয়াজী আমাদের যৌথবাহিনীর প্রধান জে. অরোরার কাছে। একাত্তরের সেই ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যের দখলমুক্ত হয়। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন স্বদেশে। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ষোলো ডিসেম্বর বাঙালির যুদ্ধ জয়ের উজ্জ্বল দিন। আজ থেকে ৪৫ বছর আগের কথা, এখনও আমরা মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে আছি, যুদ্ধের স্মৃতি তর্পণে ঐতিহাসিক দুয়ার খুলে যায়। একাত্তরের সেই অনুভূতি ও চেতনা এখনো আমাদের উদীপ্ত করে। কখনো মনে হয়, সেটি এক রূপকথার রাজ্যের প্রজার সঙ্গে রাজার লড়াই। প্রজার লক্ষ লক্ষ প্রাণ ক্ষয়, মা-বোনের সম্ভ্রমহানি আর অপরিসীম দুঃখকষ্টের বোঝা নিয়ে শরণার্থীর জীবন, মানবতার জীবন। আগরতলা, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে ভারতের মানুষ ও সরকার এ সময় পাশে না থাকলে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ দিতে হতো। এসময় জাতিসংঘের রেডক্রস, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মানবতাবাদী মানুষ আমাদের নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। আশ্রিত ও বিক্ষুব্ধ শিল্পীসমাজ এসময় গান গেয়ে, অভিনয় করে আশ্রিতদের সাহায্য করেছেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির *মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও মিত্রদের অবদান* শীর্ষক একটি পুস্তিকায় লিখেছেন–

মকবুল ফিদা হোসেনের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর ছবি এঁকে বোম্বের রাস্তায় ঘুরে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য। বিকাশ ভট্টাচার্য, প্রকাশ কর্মকার, শ্যামল দত্ত রায় আর গণেশ পাইনের মতো খ্যাতিমান শিল্পীরা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মাসের পর মাস বাংলাদেশের ওপর ছবি এঁকে বিক্রি করেছেন এবং ছবি বিক্রির টাকা শরণার্থী শিবিরে পৌঁছে দিয়েছেন। শিল্পী বাঁধন দাস ছবি আঁকা ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে গিয়ে চিকিৎসা কেন্দ্র খুলেছিলেন তাঁর এক ডাক্তার বন্ধুকে নিয়ে। অন্নদাশঙ্কর রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শান্তিময় রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রণব রঞ্জন রায়, তরুণ সান্যাল, নিখিল চক্রবর্তী, রমেণ মিত্র, ইলা মিত্র, গীতা মুখার্জী, স্বাধীন গুহ, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেশ সেন, সন্তোষ কুমার ঘোষ, গোবিন্দ হালদার, অংশুমান রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকা, হিরন্ময় কার্লেকার, অমিতাভ চৌধুরী, সুখরঞ্জন দাসগুপ্ত, মানস ঘোষ, বাসব সরকার এবং অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তীর মতো খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করতে গিয়ে নিজেরাই রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধায়। দিল্লির শিল্পী নীরেন সেনগুপ্ত, ধীরাজ চৌধুরী, জগদীশ দে আর বিমল দাসগুপ্তের মতো শিল্পীরা দিল্লি, বোম্বে আর কলকাতায় প্রদর্শনী করে ছবি বিক্রির টাকা তুলে দিয়েছিলেন বাংলাদেশ তহবিলে। শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন, গাইয়েরা বাংলাদেশের ওপর বাংলাদেশের জন্য গান গেয়েছেন, নাট্যকর্মীরা নাটক করেছেন। ঋত্বিক ঘটক, হরিসাধন দাসগুপ্ত, শুকদেব আর গীতা মেহতারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের মতো লেখক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছেন। সব মিলিয়ে ভারতের শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের ভেতর এমন ব্যক্তি খুব কমই পাওয়া যাবে, যাঁরা কোনো না কোনোভাবে তখন বাংলাদেশকে সাহায্য করেননি।

সচেতন ও খ্যাতিমানদের পাশাপাশি ভারতের সাধারণ মানুষ যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং শরণার্থীদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিল পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো দেশে এরকম নজির নেই। এই লেখকের নিজের চোখে দেখা হাজারো ঘটনার একটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বহরমপুর সীমান্তের কাছে বাংলাদেশ থেকে আসা একটি মুসলমান কৃষক পরিবার, স্বামী-স্ত্রী ও একটি শিশু আশ্রয় নিয়েছে গ্রামের এক হিন্দু কৃষক পরিবারের বাড়িতে। আশ্রয়দাতার বাড়িতে দুটি মাত্র ঘর, একটি রান্নার আর একটি শোয়ার। আশ্রয়দাতা শোয়ার ঘরটি ছেড়ে দিয়েছে আশ্রিতদের, নিজেরা থেকেছে রান্নাঘরে। দু মাস পর এই মুসলমান পরিবারটি শরণার্থী শিবিয়ে আশ্রয় লাভ করে। ২ থেকে ৩ লক্ষ শরণার্থী চেনা-অচেনা সাধারণ মানুষের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল যাদের আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও হৃদয়ের বিশালতা ছিল অন্তহীন। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠেছিল সহায়ক সংগঠন ও সংস্থা। আকাশবাণীও অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে সাহায্য করেছে। আমেরিকার বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, স্থপতি এফ আর খানের বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ, ব্রিটেনের বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি ও অ্যাকশন বাংলাদেশ, হিডস বাংলাদেশ, লিবারেশন ফ্রন্ট, মিডল্যান্ডস, মুকুলফৌজসহ কানাডা, জার্মানি, নরওয়ে, লিবিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুরসহ পৃথিবীর অনেক সংগঠন মুক্তিযুদ্ধে আর্থিক সহায়তা করেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বজনমত গড়ে তোলা এবং শরণার্থীদের আর্থিক সহযোগিতা দেবার জন্য ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে আয়োজন করা হয়েছিল 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'। মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জামাই পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং তাঁর শিষ্য-বন্ধু শিল্পী জর্জ হ্যারিসন। জর্জ হ্যারিসনের ছিল

১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ : বিজয়ীর বেশে ঘরে ফিরছে মুক্তিযোদ্ধারা

বাদ্য-বাজনা গানের দল 'বিটলস'। এই দলের অন্যরা হলেন: বব ডিলন, এ্যারিক ক্যাপটন, রিঙ্গো স্টার প্রমুখ। বিটলস- এর তখন দিনকাল ভালো যাচ্ছিল না। হ্যারিসনের দলের অন্যদের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না। শেষমেষ রবিশঙ্করের অনুরোধে এক মাস বসেছিলেন বিটলস–এর শিল্পীরা।

কনসার্টে পরিবেশিত গানগুলো হলো : ওয়াহ-ওয়াহ, সামথিংস, দ্যাট'স দি ওয়ে গড প্ল্যান্ড ইট, ইট ডোন্ট কাম ইজি, বিওয়্যার অব ডার্কনেস, হোয়াইল মাই গিটার জেন্টলি উইপস্, জামপিন' জ্যাক ফ্ল্যাশ, ইয়াং ব্লাড, হিয়ার কাম দ্য সান, অ্যা হার্ড রেইন'স আ-গুন্না ফল, ব্লুইন' ইন দ্য উইন্ড, ইট টেকস আ লট টু লাফ, ইট টেকস আ ট্রেন টু ক্রাই, জাস্ট লাইক আ ওমেন, মাই সুইট লর্ড এবং বাংলাদেশ বাংলাদেশ। সন্ধ্যার কনসার্টে আরো তিনটি গান পরিবেশিত হয়েছিল। সেগুলো হলো : ওয়েটিং অন ইউ অল, লাভ মিনস্ জিরো/নো লিমিট এবং হেয়ার মি লর্ড।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জর্জ হ্যারিসন, রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলী আকবর খান ও আল্লা রাখার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরিচয় করিয়ে দেন ডিলনসহ অন্যদের। পরিচয় পর্বের পর বক্তব্য রাখেন রবিশঙ্কর। তিনি বলেন, আপনারা কনসার্ট বাদন ও বাণী শুনবেন। আমরা শিল্পী, রাজনীতিক নই। বাংলাদেশে অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে। নরহত্যা চলছে। মানুষ মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। 'বাংলা ধুন' দিয়েই আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হবে। কনসার্টে শেষ পরিবেশনা ছিল জর্জ হ্যারিসনের 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ' শীর্ষক সেই অবিস্মরণীয় গানটি। বব ডিলনের গীটার ও হারমোনিকা শুনে মানুষ ভীষণ মুগ্ধ হয়েছিল। কনসার্ট দুবার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে দুপুর ২ টার পরে রাত ৮টায়। প্রায় অর্ধলক্ষ লোক এতে উপস্থিত ছিল। বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল মার্কিনীদের মধ্যে। কনসার্টের টিকিট বিক্রি করে ২,৪৩,৪১৮.৫১ ইউএস ডলার সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই অর্থ ইউনিসেফ-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য প্রেরণ করা হয়। কনসার্টে পরিবেশিত গানগুলো দিয়ে পরে একটি অ্যালবাম বের হয়েছিল। এর সাথে ছিল নানা তথ্যের পুস্তিকা।

কনসার্টে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন : রবিশঙ্কর : সেতার, আলী আকবর খান : সরোদ, আল্লা রাখা : তবলা (নেপথ্যে), কমলা চক্রবর্তী : তানপুরা (নেপথ্যে), জর্জ হ্যারিসন : কণ্ঠ, গিটার, বব ডিলন : কণ্ঠ, গিটার, হারমোনিকা, রিঙ্গো স্টার : কণ্ঠ, ড্রামস, তাম্বুরা, লিয়ন রাসেল : কণ্ঠ, পিয়ানো, বেস গিটার, বিলি প্রিস্টন : কণ্ঠ, অর্গান, এরিক ক্ল্যাপটন : লিড গিটার, ক্লস ভোরম্যান : বেস গিটার, জিম কেল্টনার : ড্রামস, ব্যাড ফিঙ্গার : রিদম গিটারস, নেপথ্য কণ্ঠ, জেসি এড ডেভিস : লিড গিটার, ডন প্রিস্টন : লিড গিটার, কণ্ঠ, নেপথ্য কণ্ঠ : ডন নিক্স, জো গ্রিন, জেনি গ্রিন, মার্লিন গ্রিন, ডলরেস হল এবং ক্লডিয়া লিনিয়ার।

আগস্ট মাসে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চলছে নরঘাতক পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পাকিস্তানিদের পক্ষে। প্রেসিডেন্ট নিকসন প্রশাসন বাংলাদেশ, ভারত ও রাশিয়া বিরোধী। ঠিক সেই মুহূর্তে আমেরিকার বড়ো শহরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এমন একটি অনুষ্ঠান ভাবাই যায় না এখন। অবশ্য সিনেটর কেনিডিসহ মার্কিন মুল্লুকের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে ঘোষণা দিয়ে কাজ করেছিল। এখন আমরা জানব কনসার্টের মূল আয়োজকদের কথা।

রবিশঙ্কর

সুরস্রষ্টা পণ্ডিত রবিশঙ্কর ১৯২০ সালের ৭ এপ্রিল ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক ভিটা বাংলাদেশের নড়াইলের কালিয়ায়। বাবা শ্যামশঙ্কর পেশাগত কারণে ভারতে ছিলেন। মাত্র ১১ বছর বয়সেই তিনি বড়ো ভাই উদয়শঙ্করের সঙ্গে প্যারিসে যান। উদয়শঙ্কর ছিলেন একজন নৃত্যশিল্পী। ইউরোপ থাকাকালীন আলাউদ্দিন খাঁ রবিশঙ্করকে সেতার শেখানোর প্রস্তাব দেন। সেই থেকে শুরু তাঁর সংগীতজীবন। ১৯৩৮ সালে মধ্য প্রদেশের

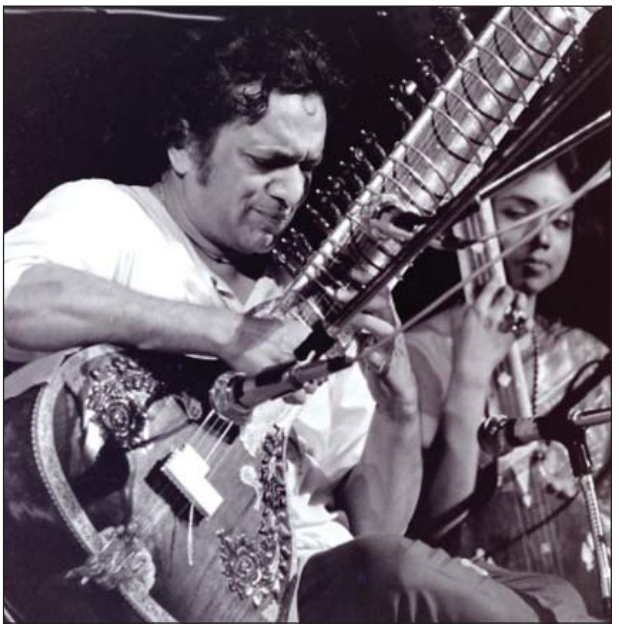

সুরস্রষ্টা পণ্ডিত রবিশঙ্কর

মাইহারে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে সেতার ও সুরবাহারের তালিম নিতে শুরু করেন রবিশঙ্কর। মাত্র এক বছরের মাথায় তিনি নিজেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেতার বাজানো শুরু করেন। মাইহারে ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে তাঁর সেতারে গুরুমুখী শিক্ষা। এরপর ফিরে আসেন মুম্বাইয়ে। ভারতের পিপল্‌স থিয়েটারে যোগ দেন। ১৯৪৯ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিও'র সংগীত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৫ সালে রেডিওতে তাঁর কর্মজীবন সমাপ্ত হয়। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রথম *পথের পাঁচালী* চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। এরপর *অপরাজিত* ও *অপুর সংসার* চলচ্চিত্রেও কাজ করেন।

দেশ-বিদেশের বহু আলোচিত চলচ্চিত্রে তিনি সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর এই খ্যাতি ১৯৫২ সালে আরো বিস্তৃত হয়। এই সময়ে আরেক বিখ্যাত বেহালা শিল্পী ইয়াহুদি মেনহিনের সঙ্গে তাঁর দিল্লিতে সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা দুজন মিলে জাতিসংঘের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো সংগীত উৎসবে সেতার পরিবেশন করেন। তাঁদের এই যুগলবন্দি পরিবেশনা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। এরপর ১৯৬৭ সালে পুনরায় দুজন 'মন্টেরি পপ' উৎসবে যোগ দেন। এই দুই খ্যাতিমান শিল্পীর যুগলবন্দি 'ওয়েস্ট মিটস ইস্ট' অ্যালবাম আকারে প্রকাশিত হয়। এবং গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে অর্জন করেছেন একাধিক পুরস্কার। এরমধ্যে ১৯৫৭ সালে *কাবুলিওয়ালা* চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক হিসেবে, বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব বিশেষ পুরস্কার, ১৯৬২ সালে সংগীত– নাটক একাডেমি পুরস্কার, ১৯৬৭ সালে পদ্মভূষণ পুরস্কার, ১৯৮১ সালে পদ্মবিভূষণ পুরস্কার, ১৯৯২ সালে র‍্যামন ম্যাগসাইসাস পুরস্কার, ১৯৯৯ সালে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাব ভারতরত্নসহ অসংখ্য পুরস্কার তিনি অর্জন করেন।

১১ ডিসেম্বর ২০১২ ক্যালিফোর্নিয়ার একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

জর্জ হ্যারিসন

বিশ শতকের অন্যতম প্রতিভাবান ও জনপ্রিয় গায়ক জর্জ হ্যারিসন ১৯৪৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাজ্যের লিভারপুল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই গিটারের প্রতি দুর্দান্ত আকর্ষণ ছিল ভবিষ্যতের এই রক স্টারের। ১৯৫৮ সালের ১৫তম জন্মদিনের আগেই ব্যান্ডের সদস্যপদ লাভ করেন হ্যারিসন। তিনি ছিলেন একাধারে গায়ক, গিটারিস্ট, সংগীত পরিচালক, চলচ্চিত্র ও রেকর্ড প্রযোজক। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত ব্যান্ডসংগীত দল 'দ্য বিটল্‌স'-এর চার সদস্যের একজন হিসেবেই তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

মূলত লিড গিটারিস্ট হলেও 'বিটল্‌স'-এর প্রতিটি অ্যালবামেই জর্জ হ্যারিসনের লেখা ও সুর করা দু-একটি গান থাকত, যেগুলো তাঁর প্রতিভার পরিচায়ক ছিল। 'বিটল্‌স'-এর হয়ে এই সময়ের গানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: 'ইফ আই নিডেড সামওয়ান', 'ট্যাক্সম্যান', 'হোয়াইল মাই গিটার জেন্টলি উইপস্', 'হেয়ার কামস্ দ্য সান' 'সামথিং' ইত্যাদি। ১৯৭০ সালে 'দ্য বিটল্‌স' ভেঙে যাওয়ার পরও তাঁর জনপ্রিয়তা কমেনি। সত্তর-পরবর্তী সময়ে তাঁর অনেক গান জনপ্রিয় হয়েছিল। তারমধ্যে 'মাই সুইট লর্ড' (১৯৭০), 'গিভ মি পিস অন আর্থ' (১৯৭৩), 'অল দোজ ইয়ার্স এগো' (১৯৮১), 'গট মাই মাইন্ড সেট অন ইউ (১৯৮৭) উল্লেখযোগ্য।

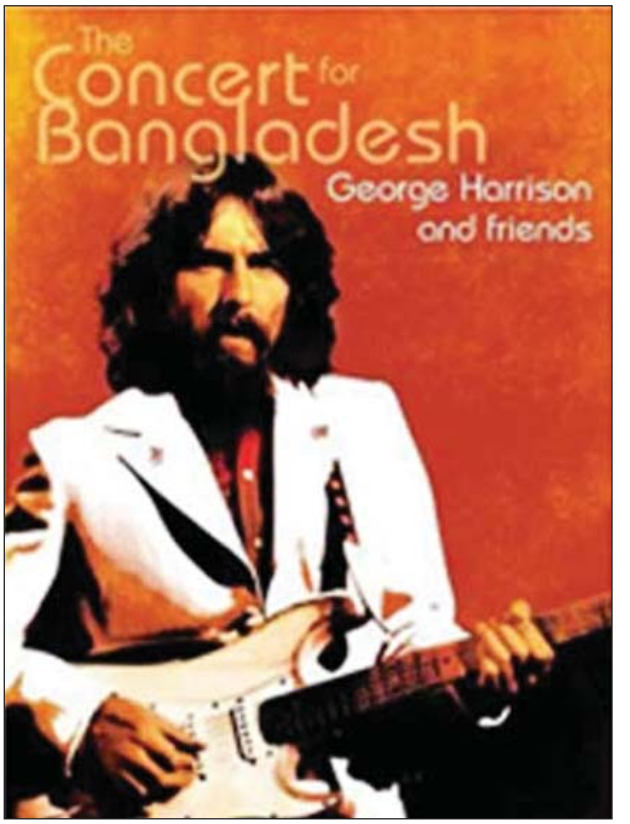

রক স্টার জর্জ হ্যারিসন

১৯৬৬ সালে জর্জ হ্যারিসন মডেল প্যাটি বয়েডের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সেই বিয়েটি বেশিদিন টিকেনি; ১৯৭৪ সালে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯৭৭ সালে অলিভিয়া ত্রিনিদাদ আরিয়াসের সঙ্গে পুনরায় বিয়ে হয় তাঁর। ১৯৭৮ সালে এই দম্পতির একটি পুত্রসন্তান জন্ম নেয়, তার নাম রাখা হয় ড্যানি হ্যারিসন।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি হ্যারিসন সনাতন মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ভারতীয় সংস্কৃতি, সংগীত, মেডিটেশন এবং সর্বোপরি সনাতন মতবাদের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা তাঁকে ভারত সফরে উদ্বুদ্ধ করে। ঐ দশকেই তিনি বেশ কয়েকবার ভারত সফর করেন এবং স্বামী বিষ্ণু দেবানন্দ, মহাঋষি মহেশ যোগীর মতো আধ্যাত্মিক গুরুদের সান্নিধ্যে আসেন। এমনকি তিনি মাছ-মাংস খাওয়াও ছেড়ে দেন।

জীবনের শেষ দিকটা সুখকর ছিল না বিশ্বখ্যাত মানবতাবাদী এই রক স্টারের। ১৯৯৯ সালে আব্রাহাম নামের এক আততায়ীর উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে আহত হন হ্যারিসন। ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি আর ৪০টিরও বেশি ছুরিকাঘাতজনিত ক্ষত নিয়ে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। ২০০১ সালে তাঁর ফুসফুসে ক্যানসার ও মস্তিষ্কে টিউমারসহ নানারকম শারীরিক জটিলতা ধরা পড়ে। ঐ বছরই ২৯ নভেম্বর তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরপারে চলে যান। হিন্দু ধর্মানুসারে তাঁর মৃতদেহের সৎকার করা হয়। ২০০২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর মরণোত্তর অ্যালবাম 'ব্রেইনওয়াশ্‌ড'।

জর্জ হ্যারিসন লিখিত, সুরারোপিত ও গীত 'বাংলাদেশ' শীর্ষক গানটির কথা

My friend came to me
With sadness in his eyes
He told me that he wanted help

Before his country dies
Although I couldn't feel the pain
I knew I had to try
Now I'm asking all of you
To help us save some lives
Bangladesh, Bangladesh
Where so many people are dying fast
And it sure looks like a mess
I've never seen such distress
Now won't you lend your hand and understand?
Relieve the people of Bangladesh
Bangladesh, Bangladesh
Such a great disaster, I don't understand
But it sure looks like a mess
I've never known such distress
Now please don't turn away
I want to hear you say
Relieve the people of Bangladesh
Relieve Bangladesh
Bangladesh, Bangladesh
Now it may seem so far from where we all are
It's something we can't neglect
It's something I can't neglect
Now won't you give some bread to get the starving fed?
We've got to relieve Bangladesh
Relieve the people of Bangladesh
We've got to relieve Bangladesh

Relieve the people of Bangladesh

বব ডিলন

বব ডিলন (পারিবারিক নাম রবার্ট অ্যালেন জিমারম্যান) ১৯৪১ সালের ২৪ মে মিনিসোটার ডুলুথে জন্মগ্রহণ করেন। ডিলনের দাদা-দাদি জিগম্যান ও আনা জিমারম্যান ইউক্রেনের ওডেসা থেকে অভিবাসিত হয়ে ১৯০৫ সালের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে বসতি স্থাপন করেছিলেন। গায়ক, গীতিকার, লেখক, সুরকার, কবি এবং ডিস্ক জকি বব ডিলন গত শতকের মধ্যভাগ থেকে পরবর্তী পাঁচ দশক ধরে জনপ্রিয় ধারার সংগীতের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজের মধ্যে অনেকগুলো গত শতকের ষাটের দশকে সৃষ্টি হয়েছে আর সেসময়ে তিনি আমেরিকায় অস্থিরতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন। তাঁর কিছু গান যেমন– 'ব্লুইন ইন দ্য উইন্ড' এবং 'দ্য টাইমস দে আর আ চেনজিন' যুদ্ধবিরোধী সংগীত হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং উনিশশ ষাটের দশকে আমেরিকান নাগরিক অধিকারের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। ডিলনের প্রথমদিককার গানের কথা ছিল মূলত রাজনীতি, সমাজ, দর্শন ও সাহিত্য-প্রভাব সংবলিত। নিজস্ব সংগীত ধারার পাশাপাশি তিনি আমেরিকার লোকগীতি ও কান্ট্রি বা ব্লুজ থেকে রক অ্যান্ড রোল, ইংরেজ, স্কটিশ, আইরিশ লোকগীতি, এমনকি জ্যাজ, সুইং, ব্রডওয়ে হার্ডরক এবং গসপেল সংগীতও গেয়েছেন। ডিলন সাধারণত গিটার, কি-বোর্ড ও হারমোনিকা বাজিয়ে গান করেন।

বিশ্বসংগীতের প্রধান অনেক শিল্পীর সঙ্গে ডিলন গান করেছেন। তারমধ্যে টম পেটি, জোয়ান বায়েজ, জর্জ হ্যারিসন, জনি ক্যাশ, উইলি লেনসন, পল সিমন, এরিক ক্ল্যাপটন, প্যাটি স্মিথ, জনি মিচেল, জ্যাক হোয়াইট, মার্লে হ্যাগার্ড, নেইল ইয়ং, ভ্যান মরিসন, রিঙ্গো স্টার, স্টিভি নিকস উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৫ সালের ২২ নভেম্বর বব ডিলন সারা লউন্ডস-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দম্পতির ঘরে পর পর জেসি বায়রন ডিলন, আন্না লিয়া, সামুয়েল ইশাক আব্রাহাম, জ্যাকব লুকে নামে চার সন্তানের জন্ম হয়। সারার আগের সংসারের মেয়ে মারিয়া লউন্ডসও তাঁদের সঙ্গেই থাকতেন। ১৯৭৭ সালের ২৯ জুন এই দম্পতির বিচ্ছেদ ঘটে।

জনপ্রিয় ধারার সংগীতের গায়ক হলেও গীতিকার হিসেবেই বেশি প্রশংসিত হয়েছেন বব ডিলন। সংগীতের অবদানের জন্য তিনি ১১ বার গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড, একবার গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড ও একাডেমি অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন। 'রক অ্যান্ড রোল হল অব ফেম', 'ন্যাশভিল সংরাইটার্স হল অব ফ্রেম ও 'সংরাইটার্স হল অব ফেমে' তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০১২ সালে তিনি 'প্রেসিডেনসিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম' অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন। *টাইম* ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বিশ শতকের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় স্থান পেয়েছে ববের নাম। *রোলিং স্টোন* ম্যাগাজিন ঘোষিত সর্বকালের ১০০ গায়কের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বব ডিলনের নাম।

২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে বব ডিলনের সর্বশেষ অ্যালবাম– 'থ্রিসমাস ইন দ্য হার্ট'। পরবর্তী সময়ে *রোলিং স্টোন* ম্যাগাজিন অ্যালবামটিকে বর্ষসেরা হিসেবে সম্মানিত করে।

ডিস্ক জকি বব ডিলন

আমাদের পরম সৌভাগ্য– মুক্তিযুদ্ধের পরীক্ষিত এই বান্ধব গীতি-কবিতা রচনার জন্য ২০১৬ সালে 'সাহিত্য নোবেল' পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তিতে গোটা বাঙালি গর্ব অনুভব করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা পাঠান।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, বর্তমান সরকার তাঁদেরকে রাষ্ট্রীয় উপাধী, সম্মাননা ও পুরস্কার প্রদান করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের এই সরকারের দায়িত্ববোধ ও উদারতা মানব জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মুক্তিযুদ্ধের ৪৫ বছর পর বিজয়ের মাহেন্দ্রক্ষণে তাই 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'- এর কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতেই হয় আমাদের।

লেখক : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মিত্ররা

শামসুজ্জামান শামস

১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এক অনন্য ঘটনা। কেননা ঠাণ্ডাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশ বিশ্বের একমাত্র দেশ যে দেশটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তাই মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হলেও ঠাণ্ডাযুদ্ধের কারণে সেটি আন্তর্জাতিক মাত্রা পায়। এর বড়ো প্রমাণ হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানের পক্ষে তথা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রকাশ্যে অবস্থান গ্রহণ, অন্যদিকে মুক্তিকামী বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সুস্পষ্ট সমর্থন জানায়। বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এ অঞ্চলের বাঙালিদের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। বাঙালি জনগণ হাজার হাজার বছর ধরে পরাধীনতার শিকলে বন্দি ছিল। বাঙালিদের মরণপণ আন্দোলন, সংগ্রাম যুদ্ধের মধ্যদিয়ে লাখ লাখ মানুষের জীবন উৎসর্গ ও চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমাদের এই চরম এবং পরম পাওয়া স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাহস ও নেতৃত্বের সততায় বাঙালিরা স্বাধীনতা পেয়েছে। আমেরিকা, চীন ও যুক্তরাজ্য–এসব শক্তিধর দেশের চরম বিরোধিতার মুখে ভারত, রাশিয়া এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সহযোগিতায় আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এবং সেই সঙ্গে দেশের সর্বস্তরের মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা সবার অকুণ্ঠ সমর্থন ও মুক্তিযুদ্ধের মহামন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়ার কারণে এই বিশাল অর্জন ও প্রাপ্তি। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা লাভ ছিল আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। স্বাধীনতা লাভের মধ্যদিয়ে আমরা ভৌগোলিক সীমানা পেয়েছি। বাংলা ভাষা হয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্রের ভাষা। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর বর্বরতা ও নৃশংসতা হিটলার-নাদির শাহকেও হার মানায়। এত মৃত্যু, এত বীভৎসতা, এত বেদনা আমরা অতীতে কখনো দেখিনি। ভবিষ্যতেও এতটা কখনো দেখব বলে মনে হয় না। তবু একাত্তর আমাদের গর্বের, গৌরবের, আনন্দের। কারণ স্বাধীনতার চেয়ে বড়ো কিছু আর কী হতে পারে। দেখতে দেখতে আমরা মহান বিজয়ের ৪৫ বছর পেরিয়ে এসেছি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের সে বর্বরোচিত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিল। এর ভেতরে পাকিস্তানি সৈন্য এবং তাদের এদেশীয় দালালদের দ্বারা পরিচালিত গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ডের মতো লোমহর্ষক কর্মকাণ্ড ঘটেছিল সারাদেশব্যাপী।

১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা

করার ক্ষেত্রে একটি আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতের সামরিকবাহিনী তথা যৌথবাহিনী পূর্ববাংলায় পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে স্পষ্টভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হয় এবং চূড়ান্ত বিজয় আসার আগেই ভারত ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। মুক্তিযুদ্ধে ভারত বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজের দেশে আশ্রয় দেওয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, মুক্তিযুদ্ধে সেনা সহায়তা দেওয়াসহ সব ধরনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদদ দিয়েছিল ভারত। ভারতের সামরিকবাহিনীর সহায়তায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে স্পষ্টভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। আর পাকবাহিনী আত্মসমর্পণের পরই বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশটি ছিল একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ভুটান। ভুটান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। সরকার ছাড়াও তৎকালীন ভুটানের জনগণও বাংলাদেশের প্রতি তাদের নৈতিক সমর্থন জানায়।

ভারতের পর আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো মিত্রশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়া সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করে। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাইন ও ধ্বংসাবশেষ অপসারণে রাশিয়ার অনেককে জীবন দিতে হয়েছে। কেবল আমাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেই নয়, বাংলাদেশের পুনর্বাসন কাজেও সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আট দিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭১-এর ৩ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে লেখা সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগোনির চিঠিটি দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। সে চিঠিতে শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের খবরে উদ্বেগ, শক্তি ব্যবহার না করে রাজনৈতিক পথেই সংকট মোকাবিলার পরামর্শ ও মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার কথা ছিল। ২৫ মার্চ গণহত্যার পর প্রথম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল ভারত। দ্বিতীয়টি সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত পত্রপত্রিকা, প্রচারমাধ্যমগুলোও বাংলাদেশে পাকবাহিনীর নির্যাতনের কাহিনি ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি প্রচার করে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাবে ভেটো প্রদান করে বাতিল করে দেয়। জবাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বঙ্গোপসাগরে অষ্টম নৌবহর পাঠাবে বলে হুংকার দিয়ে আমেরিকাকে সতর্ক করে দেয়। বিশ্বের আরো বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান যেমন–কিউবা, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানি প্রভৃতি তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন এবং যুদ্ধকে সমর্থন করেছে। ইংল্যান্ড বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অন্যতম বন্ধু ছিল। নিরাপত্তা পরিষদে ইল্যান্ড ভোটদানে বিরত থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানিয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ব্রিটেনের প্রচারমাধ্যম বিশেষ করে বিবিসি এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা বাঙালিদের ওপর পাকবাহিনীর নির্যাতন, প্রতিরোধবাঙালিদের সংগ্রাম, ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের করুণ অবস্থা, পাকবাহিনীর গণহত্যা এবং মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশ্ব জনতাকে জাগ্রত করে তোলে। ব্রিটিশ সরকারও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে খুবই সহানুভূতিশীল ছিল। উল্লেখ্য, লন্ডন ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারের প্রাণকেন্দ্র। তাছাড়া লন্ডনে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত সংগীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্বজনমত সৃষ্টি ও দান সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে ৪০ হাজার লোকের সমাগমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড ভিত্তিক গান পরিবেশন করেন।

তাছাড়া, ইংল্যান্ড বিচারপতি আবু সাইয়িদ চৌধুরীকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠন করতে অনেক সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশ গণমাধ্যমের ভূমিকাও বেশ জোরালো ছিল। ব্রিটেনের *ডেইলি টেলিগ্রাফ, গার্ডিয়ান, নিউ স্টেটসম্যান, টাইমস, ইকনোমিস্ট, সানডে টাইমস, অবজারভার, বিবিসি*সহ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য গণমাধ্যম মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি সামরিকবাহিনীর গণহত্যা, নির্যাতন ও বাঙালিদের দুর্দশা বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ব্রিটিশ গণমাধ্যমের সংবাদগুলো ছিল বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল। বাংলাদেশে গণহত্যা শুরুর পরপরই ৩১ মার্চ ম্যাসাকার ইন পাকিস্তান ('পাকিস্তানে হত্যাকাণ্ড') শিরোনামে *গার্ডিয়ান* সংবাদ ছেপেছিল। এপ্রিল মাসের ২ তারিখে *নিউ স্টেটসম্যান* 'উইপ ফর বাংলাদেশ' ('বাংলাদেশের জন্য কাঁদো') শিরোনামে একটি হৃদয়স্পর্শী সংবাদ প্রকাশ করে। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিভিন্ন হৃদয়স্পর্শী ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি করেছিল।

অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও কানাডার প্রচারমাধ্যমগুলো পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, প্রচারমাধ্যম, কংগ্রেসের অনেক সদস্য এদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। মুসলিম এবং আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথমদিকের রাষ্ট্রগুলোর একটি মিসর। মিসরের মিডিয়াতেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে লিখেছেন অনেকেই। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষদিকে কায়রোর আধাসরকারি সংবাদপত্র *আল আহরামে* সম্পাদক ড. ক্লোভিস মাসুদ ভারত থেকে শরণার্থীদের নিরাপদ এবং নিঃশর্তভাবে দেশে ফেরার একটি ব্যবস্থা করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তাগিদ দেন। এর পাশাপাশি একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের কথাও বলেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ ও পালটা আক্রমণে ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানি সামরিকবাহিনীর অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে, উপায়ন্তর না দেখে ঘটনা ভিন্ন খাতে পরিচালিত করতে তারা ৩ ডিসেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর বিকেল পাঁচটায় রেডিও পাকিস্তান সংক্ষিপ্ত এক বিশেষ সংবাদ প্রচার করে যে 'ভারত পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তজুড়ে আক্রমণ শুরু করেছে। বিস্তারিত খবর এখনো আসছে। পাঁচটা ৯ মিনিটে পেশোয়ার বিমানবন্দর থেকে ১২টি যুদ্ধবিমান উড়ে যায় কাশ্মীরের শ্রীনগর ও অনন্তপুরের উদ্দেশ্যে এবং সারগোদা বিমানঘাঁটি থেকে আটটি মিরেজ বিমান উড়ে যায় অমৃতসর ও পাঠানকোটের দিকে। দুটি যুদ্ধবিমান পাঠানো হয় ভারত ভূখণ্ডের গভীরে আগ্রায় আঘাত হানার উদ্দেশ্যে। মোট ৩২টি যুদ্ধবিমান অংশ নেয় এই আক্রমণে। ৩ ডিসেম্বর বিকেলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতাদানকালে ভারতের বিভিন্ন বিমান ঘাঁটিতে পাকিস্তানের উল্লিখিত বিমান আক্রমণ শুরু হয়। অবিলম্বে তিনি দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন। মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠকের পর মধ্যরাত্রির কিছু পরে বেতার বক্তৃতায় তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে বলেন, এতদিন ধরে 'বাংলাদেশে যে যুদ্ধ চলে আসছিল তা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। ভারতও এর জবাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং তাদের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানের হামলা প্রতিহত করে।

ভারতের সামরিকবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে যৌথবাহিনী তৈরি করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ৪ ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় স্থলবাহিনীর সম্মুখ অভিযান শুরু হয় চারটি অঞ্চল থেকে। যৌথবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে সারা দেশের সীমান্তবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রগুলো থেকে পাকিস্তানিরা পিছু হটতে শুরু করে। একের পর এক পাকিস্তানি ঘাঁটির পতন হতে থাকে। পাকিস্তানিরা অল্প কিছু স্থানে তাদের সামরিক শক্তি জড় করেছিল। যৌথবাহিনী তাদের এড়িয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঢাকার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। বাংলাদেশের আপামর জনতাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণার মাত্র ১৩ দিনের মাথায় যৌথবাহিনী ঢাকার দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। বাংলাদেশ সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হওয়ার প্রাক্কালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে একটি যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়র এতে ভেটো প্রয়োগ করায় এই প্রচেষ্টা নস্যাৎ হয়ে যায়।

ডিসেম্বরের শুরুতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত সরাসরিভাবে জড়িয়ে পড়ে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সামরিকবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে পর্যদুস্ত ও হতোদ্যম পাকিস্তানি সামরিকবাহিনী আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকেই ভারত বন্ধুর মতো বাংলাদেশের পাশে ছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সৈন্য এবং মুক্তিবাহিনী নিয়ে গঠিত মিত্রবাহিনীর কাছে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। এর আগে ৯ ডিসেম্বর এক বার্তায় গভর্নর মালিক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে জানান, 'সামরিক পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়েছে। পশ্চিমে শত্রু ফরিদপুরের কাছে চলে এসেছে এবং পূর্বে লাকসাম ও কুমিল্লায় আমাদের বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে মেঘনা নদীর ধারে পৌঁছেছে। বাইরের সাহায্য যদি না আসে, তবে শত্রু যে-কোনো দিন ঢাকার উপকণ্ঠে পৌঁছে যাবে। পুনরায় আপনাকে বলছি, আশু যুদ্ধবিরতি ও রাজনৈতিক সমাধানের কথা বিবেচনা করুন। এরপর ১০ ডিসেম্বর গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ও মুখ্য সচিব পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার মুজাফফর হোসেন ক্যান্টনমেন্টে জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং ঢাকায় জাতিসংঘের প্রতিনিধির কাছে 'আত্মসমর্পণের' আবেদন হস্তান্তর করেন। এতে অবশ্য কৌশলে 'আত্মসমর্পণ' শব্দটি বাদ দিয়ে অস্ত্রসংবরণ কথাটি ব্যবহার করা হয়। এই আবেদনে আরো লেখা ছিল, 'যেহেতু সংকটের উদ্ভব হয়েছে রাজনৈতিক কারণে, তাই রাজনৈতিক সমাধান দ্বারা এর নিরসন হতে হবে। আমি তাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট দ্বারা অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ঢাকায় সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানাই। আমি শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জাতিসংঘকে আহ্বান জানাই'।

এই আবেদন ঢাকায় জাতিসংঘের প্রতিনিধি পল মার্ক হেনরির হাতে দেওয়া হয়। পাকিস্তানি মহলে বার্তাটি মালিক-ফরমান আলী বার্তা হিসেবে পরিচিতি পায়। পরদিন তা আবার প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনারা ঢাকা ঘেরাও করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার জন্যে আহ্বান করে। গভর্নর হাউজে (বর্তমান বঙ্গভবন) বোমা ফেলার কারণে গভর্নর মালেকের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের পদলেহী সরকারও ইতোমধ্যে পদত্যাগ করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল (বর্তমান হোটেল শেরাটন) আশ্রয় নেয়। সময় থাকতে শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে আকাশ থেকে অনবরত লিফলেট ফেলা হতে থাকে। এরপর আত্মসমর্পণের পদ্ধতি নিয়ে আলাপ শুরু হলো। জেনারেল জ্যাকব জানালেন, আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান হবে রেসকোর্স ময়দানে। সেখানে প্রথমে ভারত ও পাকিস্তানবাহিনীর সম্মিলিত দল জেনারেল অরোরাকে গার্ড অব অনার প্রদান করবে। এরপর আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর হবে এবং শেষে জেনারেল নিয়াজি তার অস্ত্র ও পদবির ব্যাজ খুলে জেনারেল অরোরাকে হস্তান্তর করবে। আত্মসমর্পণ পদ্ধতির কিছু কিছু ব্যবস্থায় জেনারেল নিয়াজি আপত্তি তুলেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান তার অফিসেই হোক। শর্তগুলোর বিষয়ে জেনারেল জ্যাকবের অনড় অবস্থানের কারণে শেষে সে সবকিছুই মেনে নেয়, তবে আত্মসমর্পণের পরও নিরাপত্তার জন্য তার অফিসার ও সৈনিকদের ব্যক্তিগত অস্ত্র নিজেদের কাছে রাখার অনুমতি প্রার্থনা করে। জ্যাকব নিয়াজির এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন।

সকাল ১১টায় কলকাতার থিয়েটার সড়কস্থ অফিসে ভারতীয় সামরিকবাহিনীর লিয়াজোঁ অফিসার কর্নেল পি দাস প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ফারুক আজিজ খানের মাধ্যমে বিকেলে অনুষ্ঠেয় পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর জানান। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম এ জি ওসমানীর খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারলেন কর্নেল ওসমানী ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বল গুপ্ত (ভারতীয়বাহিনী) এবং লেক্স কর্নেল আব্দুর রবকে নিয়ে সিলেটের দিকে মুক্ত এলাকা পরিদর্শনে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকারকে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য জেনারেল অরোরার সঙ্গে ঢাকা যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

এ সময় গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার সরকারি কাজে তার অফিসের বাইরে ছিলেন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার ফিরে আসা মাত্র প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ফারুক ও মেজর ইসলামকে নিয়ে দমদম বিমানবন্দরের দিকে সামরিক পোশাক ছাড়াই রওনা হন।

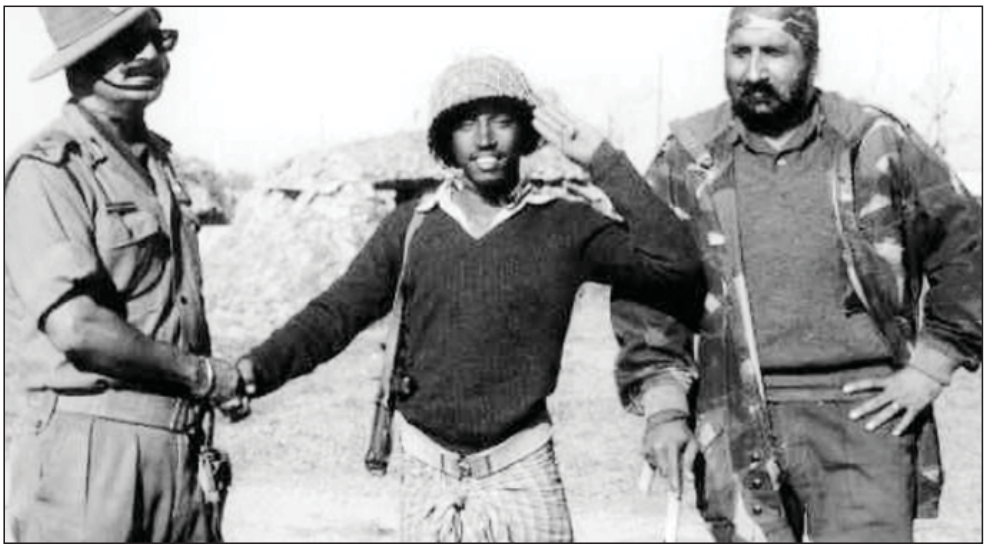

মিত্রবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধারা, ১৯৭১

প্রশিক্ষণরত মুক্তিযোদ্ধারা

প্রায় একই সময় জেনারেল অরোরা এবং তার স্ত্রী মিসেস বান্তি অরোরাকে নিয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছান। গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার জেনারেল অরোরার কাছে নিজের পরিচয় দেওয়ার পর জেনারেল অরোরা মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে তাকে আগে পরিবহণ বিমানে আরোহণের জন্য আহ্বান করলেন। এই বিমানে মিসেস অরোরা প্রথমে উঠলেন। এরপর উঠলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার এবং শেষে জেনারেল অরোরা। ঢাকা বিমানবন্দরের রানওয়ে বোমাবর্ষণের কারণে ক্ষতবিক্ষত থাকায় বিমানটি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে আগরতলায় যায়। আগরতলায় জেনারেল অরোরার সাথে যোগাদান করেন চতুর্থ কোর কমান্ডার জেনারেল সাগাৎ সিং এবং ওই কোরের অন্য ডিভিশন কমান্ডাররা। এরপর হেলিকপ্টারগুলো আড়াইটার দিকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বিকেল চারটার আগেই বাংলাদেশ নিয়মিত বাহিনীর দুটি ইউনিটসহ মোট চার ব্যাটালিয়ান সৈন্য ঢাকায় প্রবেশ করে, সঙ্গে কয়েক সহস্র মুক্তিযোদ্ধা। ঢাকার জনবিরল পথঘাট ক্রমে জনাকীর্ণ হয়ে উঠতে শুরু করে 'জয় বাংলা' স্লোগানে মুখরিত মানুষের ভিড়ে। বিকাল সাড়ে ৪টায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সামনে হানাদারবাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর সকালে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক কর্মকর্তা জন কেলি ঢাকা সেনানিবাসের কমান্ড বাঙ্কারে পৌঁছান। সেখানে লে. জেনারেল নিয়াজিকে পাওয়া গেল না। বিধ্বস্ত অবস্থায় পাওয়া গেল প্রাদেশিক সরকারের বেসামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে। রাও ফরমান জন কেলিকে বলেন, মিত্রবাহিনীর কাছ থেকে তারা আত্মসমর্পণের প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। কিন্তু মিত্রবাহিনীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় এ খবরটি তাদের জানাতে পারছে না। এসময় জন কেলি রাও ফরমানকে জাতিসংঘের বেতার সঙ্কেত ব্যবহারের প্রস্তাব দেন। এ সময় আত্মসমর্পণের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয় বিকাল সাড়ে ৪টা। ঢাকাবাসী যখন এ আত্মসমর্পণের সময় জানতে পারল তখন তারা মেতে ওঠে আনন্দ-উল্লাসে। এই দিন সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে মিত্রবাহিনী ঢাকায় প্রবেশ করে। তার আগেই বঙ্গ বীর কাদের সিদ্দিকী মিরপুর ব্রিজ দিয়ে ঢাকায় ঢুকে পড়েন। বিকাল বেলায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রস্তুত হলো এক ঐতিহাসিক বিজয়ের মুহূর্তের জন্য। বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সামরিকবাহিনীর ৯৩ হাজার সৈন্য বিনা শর্তে যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

এ আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন পূর্বাঞ্চলের যৌথবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক লে. জে. একে নিয়াজি। এ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন মুক্তিবাহিনীর উপসেনাপ্রধান ও বিমানবাহিনী প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার। এ অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন এস ফোর্স অধিনায়ক লে. কর্নেল কেএম সফিউল্লাহ, ২নং সেক্টরের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর এটিএম হায়দার এবং টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক কাদের সিদ্দিকী।

হানাদার পাকবাহিনী আত্মসমর্পণের আগে আত্মসমর্পণ নিয়ে বেশ দেরদরবার চালিয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে বেশ আলোচনাও হয়েছিল। কর্নেল আরোরা আত্মসমর্পণের শর্তগুলো পড়ে এর খসড়া কপি জেনারেল নিয়াজিকে দিলেন। এই খসড়ার বিষয় নিয়ে পাকিস্তানি সেনাপতিরা আপত্তি তুললেও শেষ পর্যন্ত খসড়াটিকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আত্মসমর্পণ দলিলে কী ছিল তা তুলে ধরা হলো।

পূর্ব রণাঙ্গনে ভারতীয় ও বাংলাদেশি যৌথবাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ড বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানের সব সশস্ত্রবাহিনী আত্মসমর্পণে সম্মত হলো। পাকিস্তানের স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীসহ সব আধা-সামরিক ও বেসামরিক সশস্ত্রবাহিনীর ক্ষেত্রে এই আত্মসমর্পণ প্রযোজ্য হবে। এই বাহিনীগুলো যে যেখানে আছে, সেখান থেকে সবচেয়ে নিকটস্থ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কর্তৃত্বাধীন নিয়মিত সেনাদের কাছে অস্ত্রসমর্পণ ও আত্মসমর্পণ করবে।

এই দলিল স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ড লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার নির্দেশের অধীন হবে। নির্দেশ না মানলে তা আত্মসমর্পণের শর্তের লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে এবং যুদ্ধের স্বীকৃত আইন ও রীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আত্মসমর্পণের শর্তাবলির অর্থ অথবা ব্যাখ্যা নিয়ে কোনো সংশয় দেখা দিলে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আত্মসমর্পণকারী সেনাদের জেনেভা কনভেনশনের বিধি অনুযায়ী প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান দেওয়ার পবিত্র প্রত্যয় ঘোষণা করছেন এবং আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সামরিক ও আধা-সামরিক ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ও সুবিধার অঙ্গীকার করছেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীন বাহিনীগুলোর মাধ্যমে বিদেশি নাগরিক, সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ও জন্মসূত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যক্তিদের সুরক্ষা দেওয়া হবে।

লেখক: কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক

বুদ্ধিজীবী দিবস

ছড়িয়ে পড়ুক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে

রোকেয়া আক্তার

১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় 'কাঁটাসুরের বধ্যভূমি' শীর্ষক এক মর্মস্পর্শী প্রতিবেদনে অধ্যাপিকা হামিদা রহমান বুদ্ধিজীবীদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে যে বিবরণ তিনি উল্লেখ করেছেন তা সত্যি সত্যি হৃদয়বিদারক। সেই প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'আর একটু দূরে যেতেই দেখতে পেলাম, একটি কঙ্কাল। শুধু পা দুটো আর বুকের পাঁজরটিতে তখনো অল্প মাংস আছে। বোধহয় চিল-শকুন খেয়ে গেছে। কিন্তু মাথায় খুলিটিতে লম্বা লম্বা চুল। চুলগুলো ধূলো-কাদায় মিলে গিয়ে নারী দেহের সাক্ষ্য বহন করছে। আর একটু এগিয়ে যেতেই একটা উঁচু স্থানে বেশ কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছে। আমি উপরে উঠতে একজন ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে আমাকে উপরে উঠিয়ে নিলেন। সামনে দেখি নিচু জলাভূমির ভেতর এক ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্য। সেখানে এক নয়, দুই নয় একেবারে বারো-তেরোজন সুস্থ- সবল মানুষ। একের পর এক শুয়ে আছে। পাশে দুটো লাশ, এরমধ্যে একজনের হৃদপিণ্ড যেন ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। সেই হৃৎপিণ্ড ছেঁড়া মানুষটি হলো ডাক্তার রাব্বী।... মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি জলার পাশে হাজার হাজার মাটির ঢিবির মধ্যে কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোককে যে মাঠে হত্যা করা হয়েছে'।

দেশ যখন স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত তখন পাকিস্তানিরা বুঝে ফেলল কোনোভাবেই বাঙালি জাতিকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানি হায়েনারা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের চিহ্নিত করে তাদের নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। মেতে ওঠে পৈশাচিক উল্লাসে। মূলত বাঙালি শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদগণ এই সুপরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞের শিকার হন।

যুদ্ধে যখন বাঙালি বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত তখন পাকিস্তানের গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এক সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি এদেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের নিঃশেষ করে বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। তারই পরিকল্পনা মাফিক পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগিতায় রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ধরে ধরে নির্মমভাবে হত্যা করে। ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড চালায় পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের নিশ্চিহ্ন করার এই নীল নকশা প্রণয়ন করে ১২ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের সেনা সদর দফতরে আলবদর ও আলশামস বাহিনীর হাতে বুদ্ধিজীবীদের তালিকা তুলে দেন তিনি।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাঙালি বুদ্ধিজীবী নিধনের বিষয়টিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিতে শুরু করে পাকিস্তানিরা। একাত্তরের ১০ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলশামস, আলবদর বাহিনীর সদস্যরা তুলে নিয়ে যায় দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন ও পিপিআই-এর চিফ রিপোর্টার সৈয়দ নাজমুল হককে। গবেষকরা অবশ্য তাদের গবেষণায় বলছেন, ২৫ মার্চের কালোরাতেই পাকিস্তানিরা অনানুষ্ঠানিকভাবে শুরু করে বুদ্ধিজীবীদের নিধন

এবং তা চলে যুদ্ধের পুরো নয় মাসজুড়ে। এমনকি '৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে বিজয় লাভের পরেও বুদ্ধিজীবীদের নিধন অব্যাহত থাকে। যেমন ড. মনসুর আলীকে হত্যা করা হয় ২১ ডিসেম্বর আর চলচ্চিত্রকার, গল্পকার জহির রায়হান নিখোঁজ হন বাহাত্তরের ৩০ জানুয়ারি মিরপুরে। বুদ্ধিজীবীদের এই হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় এবং ক্রমে তা সমগ্র দেশে বিশেষত জেলা ও মহকুমা শহরে সম্প্রসারিত হয়। হত্যাকারীরা বুদ্ধিজীবীদের গেস্টাপো কায়দায় ধরে নিয়ে কালো কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে কোনো বিশেষ ক্যাম্পে বা বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, শহরে জারিকৃত কারফিউয়ের সুযোগে বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাদের ওপর চালানো হয়েছিল নির্মম নির্যাতন, যে নির্যাতনকে হার মানায় মধ্যযুগীয় বর্বরতা। বেয়নেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে হত্যা করা হয়েছিল দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের।

জানা যায়, ঢাকা শহরের দুটি বধ্যভূমির মধ্যে একটি ছিল মোহাম্মদপুরের কাছে রায়ের বাজারের জলাভূমি, অপরটি ছিল মিরপুরে। যুদ্ধের পরে এ দুটি বধ্যভূমির ডোবা, নালা, ইটের পাঁজারের মধ্যে অসংখ্য মৃতদেহ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। এসব মৃতদেহের অধিকাংশের চোখ কালো কাপড়ে বাঁধা ছিল, হাত পেছন দিক থেকে বাঁধা। এসব মৃতদেহের মাথায় ও পিঠে বুলেটের চিহ্ন ছিল। আর সারাদেহে ছিল বেয়নেটের ক্ষতচিহ্ন।

২

একই বছর অর্থাৎ বাহাত্তরের ৮ জানুয়ারি দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় মিরপুরের শিয়ালবাড়ী বধ্যভূমি নিয়ে আনিসুর রহমানের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে কুটিকুটি করে কাঁটা বুদ্ধিজীবীদের হাড়ের ছবিও ছাপা হয়। বধ্যভূমির সেই প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেছেন, '...অথবা যদি না যেতাম সেই শিয়ালবাড়ীতে তাহলে দেখতে হতো না ইতিহাসের বর্বরতম অধ্যায়কে। অনুসন্ধিৎসু হিসেবে যা দেখাও কোনো মানুষের উচিত নয়। ওখানে না গেলে গায়ে ধরত না এমন দহনজ্বালা। সহ্য করতে হতো না ভয়-ক্রোধ, ঘৃণা মিশ্রিত এমন তীব্র অনুভূতি– যে অনুভূতি বলে বুঝাবার নয়'।

১৯৭১ সালের ১৯ ডিসেম্বর *দৈনিক বাংলা* পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হওয়ার ঘটনা নিয়ে 'শতাব্দীর জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড সংঘটন করেছে আলবদর বর্বর বাহিনী' শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়, 'স্বাধীনতার আনন্দ, উচ্ছ্বাসের মাঝে গতকাল শনিবার বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরীতে করুণ ছায়া নেমে আসে। মুক্তির আনন্দকে ছাপিয়ে ওঠে কান্নার রোল। শতাব্দীর জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে ঢাকা নগরী ও বাংলাদেশে গত ফেব্রুয়ারি থেকে। তা আরো চরম হয়ে উঠেছিল মুক্তির পূর্বক্ষণে।... গতকাল রায়েরবাজার ও ধানমন্ডি এলাকায় বিভিন্ন গর্ত থেকে প্রচুর সংখ্যক লাশ উদ্ধার করা হয়। এদের মধ্যে অধ্যাপক, ডাক্তার, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের লাশও রয়েছে। এ পর্যন্ত কতিপয় লাশ চেনারও উপায় নেই।'

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড নিয়ে যারা দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন তারা বলছেন, হত্যাকাণ্ডের এই নীলনকশা প্রণয়ন করে জেনারেল রাও ফরমান আলী। ১২ ডিসেম্বর সেনা সদর দফতরে আলবদর ও আলশামস বাহিনীর হাতে বুদ্ধিজীবীদের তালিকা তুলে দেন তিনি। পাকিস্তানি বাহিনীর অস্ত্র সহায়তা নিয়ে তাদেরই ছত্রছায়ায় আধাসামরিক বাহিনী আলবদরের ক্যাডাররা এই বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে। যদিও এর আগেই সারাদেশেই শুরু হয়ে গেছে বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ।

ঘাতকরা বেছে বেছে যাদের হত্যা করেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এ এন এম মুনীর চৌধুরী, ড. জিসি দেব, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, আবদুল মুকতাদির, এস এম রাশীদুল হাসান, ড. এন এম ফয়জুল মাহী, ফজলুর রহমান খান, এ এন এম মুনীরুজ্জামান, ড. সিরাজুল হক খান, ড. শাহাদাত আলী, ড. এম এ খায়ের, এ আর খান খাদিম, মোঃ সাদেক, শরাফত

শহীদ বুদ্ধিজীবীগণ

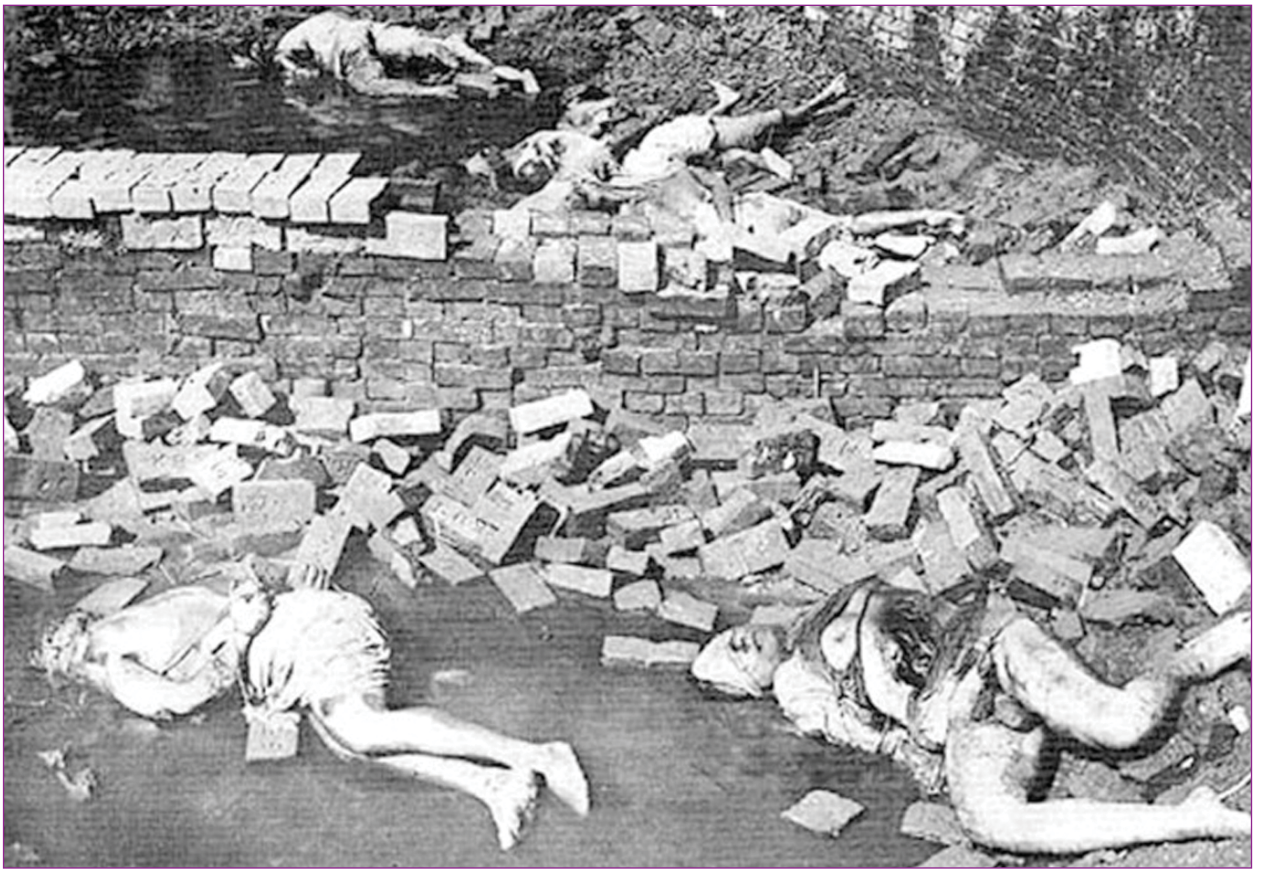

রায়েরবাজার বধ্যভূমি

আলী, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক– অধ্যাপক মীর আবদুল কাইয়ুম, হবিবর রহমান, সুখরঞ্জন সমাদ্দার, ড. আবুল কালাম আজাদ। সাংবাদিক– সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদুল্লা কায়সার, খোন্দকার আবু তালেব, নিজামুদ্দীন আহমদ, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, শহীদ সাবের, শেখ আবদুল মান্নান (লাডু), সৈয়দ নজমুল হক, এম আখতার, আবুল বাসার, চিশতী হেলালুর রহমান, শিবসদন চক্রবর্তী, সেলিনা পারভীন। এছাড়া শিল্পী আলতাফ মাহমুদ, মেহেরুন্নেসা, দানবীর রণদাপ্রসাদ সাহাসহ আরো অনেক নাম রয়েছে।

৩

বাঙালি জাতি সশ্রদ্ধচিত্তে ১৯৭২ সাল থেকে ১৪ ডিসেম্বরকে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করে আসছে। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১৪ ডিসেম্বরকে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ঘোষণা করেছিলেন। কারণ অপহরণ ও পরে নির্বিচারে হত্যা এই ১৪ ডিসেম্বরেই অর্থ্যাৎ পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাঙালির বিজয় অর্জন তথা বিজয় দিবসের ঠিক দুদিন পূর্বে, সংগঠিত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১ মুজিবনগর সরকারের এক মুখপাত্র জানান, ১৬ ডিসেম্বরে আত্মসমর্পণের পূর্বে পাকবাহিনী এবং তাদের সহযোগীরা মিলে ৩৬০ জন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। লেখক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, সংগীত শিল্পী, শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, উকিল, চিকিৎসক, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারি-বেসরকারি কর্মী, নাট্য-কর্মী, জনসেবায় নিয়োজিত কর্মীদের বুদ্ধিজীবী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশ' নামক প্রামাণ্যচিত্রে উল্লেখ করা হয়, স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে ৬৩৭ জন প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক, ২৭০ জন মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক এবং ৫৯ জন কলেজ শিক্ষককে হত্যা করা হয়।

দৈনিক পত্রিকাগুলো নিখোঁজ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ সপ্তাহে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। গোপন তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ একদল সাংবাদিক ঢাকার পশ্চিমে রায়ের বাজার এলাকায় পচনশীল, ক্ষত-বিক্ষত লাশের একটি গণকবরের সন্ধান লাভ করে। জাতির মেধাবী ব্যক্তিবর্গের দেহগুলো অত্যাচারের সুস্পষ্ট চিহ্ন নিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, একে-অন্যের নীচে চাপা পড়েছিল। লালমাটিয়ায় শারীরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সাংবাদিকরা একটি বন্দিশালা আবিষ্কার করে, যা ছিল রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ ও কামালউদ্দিন, চিকিৎসক ফজলে রাব্বী, আব্দুল আলিম চৌধুরী, আবুল খায়ের এবং সাংবাদিক মুহাম্মদ আখতারের পচনশীল লাশগুলো পরিবার কর্তৃক শনাক্ত করা হয় সেদিনই। সাংবাদিক সেলিনা পারভিনের লাশ শনাক্ত করা হয় পরের দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সিরাজুল হক, ফাইজুল মহি এবং চিকিৎসক গোলাম মুর্তোজা, আজহারুল হক, হুমায়ুন কবীর ও মনসুর আলীর লাশ পরবর্তীতে চিহ্নিত করা হয়। লাশ শনাক্তকরণের সময় শহিদ বুদ্ধিজীবীদের পরিবারের সদস্যদের অনেকেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন।

৪

প্রতিবছর বুদ্ধিজীবী দিবস বাঙালির মনে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে একটি প্রশ্ন রেখে যায়। বুদ্ধিজীবীরা যেমন তাদের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন দেশের জন্য, মানুষের জন্য, কল্যাণের জন্য সর্বোপরি স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন দিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

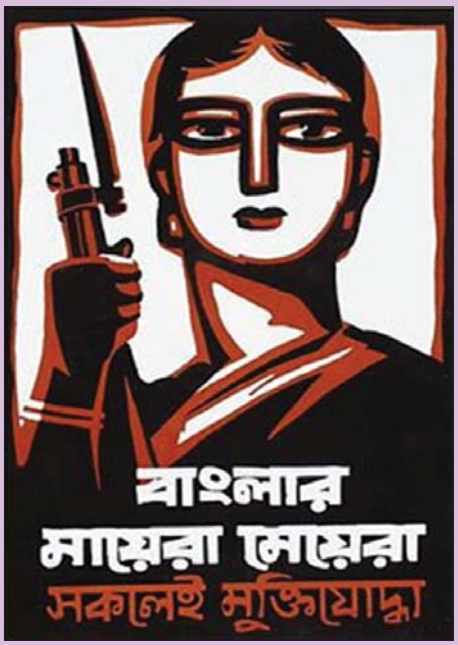

মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা

বাকী বিল্লাহ

মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারীরা অন্যতম ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বত্রই নারীদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তারা মুক্তিযুদ্ধে অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ থেকে শুরু করে সম্মুখযুদ্ধ পর্যন্ত সবই করেছেন। নানা কৌশলে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র এগিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে খাবারের ব্যবস্থা, আগাম গোপন তথ্য আদান-প্রদানে নারীরা ছিল এগিয়ে। মুক্তিযুদ্ধকালীন নানা নির্যাতন, যন্ত্রণা, পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর শত বর্বরতার মধ্যেও বাংলার মায়েরা, মেয়েরা সকলে কোনো না কোনো ভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন। আর এই সহায়তা করতে গিয়ে অনেকেই নির্যাতিত হয়ে শহিদ হয়েছেন। কেউ কেউ বীরাঙ্গনা হয়ে এখনো বেঁচে আছেন। আবার কেউ কেউ গুলি ও বোমার আঘাতে অঙ্গ হারিয়েছেন। গুলিবিদ্ধ হয়ে বহু নারী মুক্তিযোদ্ধা হানাদারবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জানিয়েছেন। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হানাদারবাহিনীর ক্যাম্পে আঘাত হানা হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার এই সব নারী মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছিল। বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা হালনাগাদ তৈরির কাজ করেছেন। যেখানে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তা সংগ্রহ করা হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রায় অর্ধেক ছিল নারী। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের মধ্যে কেউ সরাসরি অংশগ্রহণ করে আবার কেউ কোনো না কোনো ভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছে। বিমানের রাডারের মতো তারা নানা কৌশলে ভেতরে বাইরের খবর আদান-প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সরকার কর্তৃক খেতাবপ্রাপ্ত ৬৭৬ জন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ২জন নারী বীর প্রতীকও রয়েছেন। তাঁরা হলেন, মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি ও ক্যাপ্টেন সিতারা।

যুদ্ধকালীন নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ ও যৌন অপরাধ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং এটি একটি পরিকল্পিত বিষয় এবং যুদ্ধ কৌশল। যুদ্ধকালীন সময় সাধারণভাবে দখলদারিত্ব ও আধিপত্য বিস্তরের কৌশল হিসেবে নারী নির্যাতন এবং ধর্ষণের ব্যবহার হয়ে থাকে। এটি একটি জাতির মানসিক মুক্তিকে পর্যুদস্ত করার উপায় হিসেবে ভাবা হয়। কেননা, এটি আঘাত হানে নারীর সম্মানের উপর। এই সম্মান মূলত পুরুষের, কারণ প্রচলিত ভাবধারা অনুযায়ী পুরুষরা অনেক ক্ষেত্রে নারীর অভিভাবক। তাই নারীর প্রতি এই আচরণের অর্থ পুরুষ অভিভাবককে হেয় করা। তার পৌরষত্বকে চ্যালেঞ্জ করা। তাই নারীর উপর নির্যাতন ছিল একটি যুদ্ধ কৌশল। আর এই যুদ্ধ কৌশলের নির্যাতনের শিকার হন কেবল নারীরাই।

মুক্তিযুদ্ধে টানা নয় মাস সারা দেশে ২ লাখ নারী, পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ও তাদের দোসর, রাজাকারদের হাতে ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। আরও বহু নারী নানাভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও স্বজন হারা হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে বহু নারী অসহায় হলেও আবার তারা সাহসী হয়ে যুদ্ধ করেছেন। তারা মুক্তিযুদ্ধে বীর যোদ্ধাদেরকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন।

বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা গেছে, বাঙালি মেয়েদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও ঘরের বাইরে গিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও আন্দোলন সংগ্রাম দীর্ঘদিন আগের। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেও তাদের ভূমিকা ছিল। মহান ভাষা আন্দোলনে ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক আমতলার সভায় যোগদান করে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে এবং ১৪৪ ধারা অমান্য করে ছাত্রীরা বেরিয়ে আসেন। ওই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজের অনেক ছাত্রী রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই স্লোগান দিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন। ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের নানাভাবে ভূমিকা রাখতে গিয়ে পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। সেই থেকে শুরু করে বাংলার স্বাধীনতার জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা স্মরণীয়। সেই স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত নারী নেত্রীরা জঙ্গিবাদ ও সম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এখনো আন্দোলন করে যাচ্ছেন।

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে নারীরা নানা কৌশলে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এরমধ্যে বন্দুক চালানো, গ্রেনেড নিক্ষেপ, ব্যারিকেড তৈরী, আত্মরক্ষাতে মরিচের গুড়া শত্রুর গায়ে নিক্ষেপ, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পাহাড় ঘেরা নির্জন জায়গায় ও কোনো বাড়িতে এই সব প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ নারীরা এই সব প্রশিক্ষণ দিত। এরমধ্যে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে যে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল তাতে ছেলেদের পাশাপাশি তরুণী,

সচেতন ছাত্রীদের অংশগ্রহণও ছিল উল্লেখযোগ্য।

কাঠের বন্দুক হাতে নিয়ে বহু ছাত্রী অস্ত্র প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদেরকে নিয়ে প্রথম সশস্ত্র বিগ্রেড তৈরি করেন একজন নারী কমান্ডার। সেখানে ছাত্রীদেরকে রাইফেল চালানো, শরীর চর্চা, ব্যারিকেড তৈরি ও প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হয়। ঢাকার কলাবাগান, রাজারবাগ, ধানমন্ডি, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে প্রথমে নারী বিগ্রেড তৈরি ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ওই সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের অনেক নেত্রী সশস্ত্র ট্রেনিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন।

জানা গেছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জনতার সঙ্গে রাজনৈতিক সচেতন নারী নিজস্ব দায়িত্ব বোধ থেকে অস্ত্র হাতে নিয়ে ছদ্মবেশে শার্ট-প্যান্ট পরে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। সংগ্রামী শিরিন বানু মিতিল (ছাত্র ইউনিয়ন নেত্রী ছিলেন) স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে লেখাপড়া করতেন। '৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী পাবনা শহরে ঢুকে কারফিউ জারি করে রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার ও নির্যাতন চালালে ওই সময় স্থানীয় প্রশাসন ও সাধারণ মানুষ পাল্টা আঘাত হানার প্রস্তুতি নেয়। সেখানে মেয়েরা প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুতি নেয়। তখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যরা জনতার হাতে অস্ত্র তুলে দেয়। একই সঙ্গে অস্ত্র চালানো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কম সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে থ্রি নট থ্রি রাইফেল চালানো শিখে শিরিন বানু সরাসরি প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের সময় তিনি শার্ট-প্যান্ট পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে ২৮ মার্চ পাবনায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখলরত ৩৬ জন পাক হানাদারবাহিনীর সঙ্গে জনতার যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে জনতার সঙ্গে তিনিই ছিলেন একমাত্র নারী যোদ্ধা। ওই যুদ্ধে ৩৬ জন পাক হানাদারবাহিনীর সদস্য নিহত হয়। আর শিরিন বানুর দলের ২ সদস্য শহিদ হন। ৭১ সালের ৩১ মার্চ পাবনা পালিটেকনিক ইনস্টিটিউটে যে কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হয় সেখানে তিনি ছদ্মবেশে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত ছিলেন। এক পর্যায়ে ভারতীয় একজন সাংবাদিকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলে ছবিসহ তার সাক্ষাৎকার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যার ফলে অন্যান্য নারী ও ছাত্রীদের মধ্যে চেতনা জাগ্রত হয়। এই ভাবে নারী মুক্তিযোদ্ধারা নানাভাবে অবদান রেখে গেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য ভারত সীমান্তে গেরিলা ট্রেনিং গ্রহণ করেন। তখন বাংলার মেয়েরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠে। কলকাতায় একমাত্র মহিলা মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপিত হয়। ওই ট্রেনিং ক্যাম্পটি গোবরা ক্যাম্প হিসেবে পরিচিত। বর্তমান আওয়ামী লীগ নেত্রী সাজেদা চৌধুরী ওই ক্যাম্পটি পরিচালনা করতেন। ওই ক্যাম্পে মোট ৪০০ নারী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। ওই ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষণের আগে নারীদের সাহসিকতা, রাজনৈতিক চেতনা ও দেশপ্রেম সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া হতো। তারপর তাদেরকে ট্রেনিং ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হতো। প্রতিজন নারী যোদ্ধাকে ট্রেনিং ক্যাম্পের কঠোর নিয়ম নীতি মেনে চলতে হতো। তাদেরকে প্রথমে দুইটি প্রশিক্ষণ দেয়া হত। এরমধ্যে প্রথমে আহত যোদ্ধাকে সেবাদান অর্থাৎ ফাস্ট এইড ট্রেনিং এবং দ্বিতীয় ছিল সশস্ত্র যুদ্ধের প্রশিক্ষণ। ভারতের ইন্টেলিজেন্স শাখার একজন অবসপ্রাপ্ত অফিসার তাদেরকে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিতেন। সেখানে ১৬জন করে তিনটি গ্রুপে ৪৮জন সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতেন। তার মধ্যে শিরিন বানু মিতিল ছিলেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধে আগরতলা গেরিলা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই সময়ের রোকেয়া হলের ছাত্রলীগ শাখার নেত্রী ফোরকান বেগমসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেত্রীরা সীমান্ত অতিক্রম করে আগরতলায় যান। সেখানে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণের ক্যাম্প থাকায় তিনি ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাদের কাছে গেরিলা প্রশিক্ষণ নেন। কিশোর ও তরুনী নেত্রীদের গেরিলা ও সুইসাইড স্কোয়াডের আধুনিক অস্ত্রের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেখানে মহিলা গেরিলা স্কোয়াডের নেতৃত্বে ছিলেন ফোরকান বেগম।সেই প্রশিক্ষণে সব ধরনের আধুনিক অস্ত্র চেনা, পরিচালনা ও ধ্বংস করার কলাকৌশল শিখানো হতো। আর শত্রু শনাক্ত ও তাদের ব্যবহৃত গোপন কোড ও সামরিক সরঞ্জাম চিহ্নিত করে আক্রমণ চালানো হয়। বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনাসমূহ আক্রমণ করে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার ব্যবস্থা করা হয়। এই ভাবে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীরা ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। তাদের অবদান ছিল সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ।

শুধু যুদ্ধই নয়, নারীরা নাটক, সংগীত, মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণাদায়ী বিভিন্ন ধরনের নাটক ও সংগীত পরিবেশন করে জনগণের মধ্যে প্রেরণা জাগিয়েছেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য জয় বাংলা বাংলার জয়---, পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, জনতার সংগ্রাম চলবেই---, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে

যুদ্ধ করি---,অত্যাচারের পাষাণ জ্বালিয়ে দাও----, আমার সোনার বাংলা----- ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এইভাবে নানা ধরনের প্রেরণা জাগানো গান গেয়ে নারীরা মুক্তিযুদ্ধকালে উৎসাহ দিয়েছেন। আবার কেউ রনাঙ্গণে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছেন। প্রতিটি স্থানে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ও তাদের দেশীয় দোসরদের দূর্গে একের পর এক আঘাত হানায় দিশেহারা হয়ে পড়ে পাক হানাদারবাহিনী।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জাতি যখন গভীর সংকটের মোকাবিলা করে, নারীরা তখন দুর্ভোগের শিকার হন সবচেয়ে বেশি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় নারী সমাজেরও অবর্ণনীয় দুর্ভোগ আর যন্ত্রণা সইতে হয়েছে। এই সংকট আর দুর্ভোগ কাটিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে দালালদের বিচারের দাবিতে নারীরা বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। এরই প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশে দালাল আইন প্রণীত হয়েছিল। তখন অনেক দালালের বিচার শুরু হয়। কিন্তু পরবর্তীতে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর আইনটি বাতিল করার মাধ্যমে অকার্যকর হয়ে যায়। এরপর বর্তমান আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন করে নারী মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের সম্মান ও খেতাব দেওয়াসহ তাদের জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে ২০টির বেশি সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরজাহান বেগম ওরফে কাঁকন বিবি। তিনি খাসিয়া মুক্তি বেটি নামেও পরিচিত। তিনি ছদ্মবেশে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র যোগান দেয়া থেকে শুরু করে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আরেক বীর মহিলা যোদ্ধা তারামন বিবি। তাঁর জন্ম কুড়িগ্রামে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর সাহসিকতার জন্য তাঁকে বীরপ্রতীক খেতাব দেন। তিনি একাধিকবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পাকিস্তানী হানাদারবাহিনীর শত্রুদের পরাস্ত করেন। অনেকবার তাদের ক্যাম্প পাকবাহিনী আক্রমণ করলেও তিনি কৌশলে বেঁচে যান। শুধু রনাঙ্গনের লড়াই নয়, ভয়, অভাব আর অনিশ্চয়তার মধ্যেও নারীরা পেছন থেকে সমাজ ও সংসার টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম চালিয়েছিল। আর তাদের পরিবারের পুরুষরা যখন দেশের জন্য যুদ্ধ করছে। তখন নারীরা সংসারের হাল ধরে নানাভাবে দুঃখে কষ্টে দিন কাটিয়েছে। তাদের অবদান কোনো অংশে খাটো করে দেখা ঠিক হবে না।

নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মতে, মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসের কথা বলতে গেলে নারীদের অবদানের কথা লিখে শেষ করা কষ্টকর হবে। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে বটতলায় এক সভায় রোকেয়া হল থেকে ছাত্রীরা মিছিল নিয়ে গিয়েছিল। তাদের স্লোগান ছিল বাংলার মানুষ অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর। তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা। পিন্ডি না ঢাকা ? ঢাকা ঢাকা। স্বাধীন কর, স্বাধীন কর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর ইত্যাদি। ওই দিন ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শত শত ছাত্রীর বিশাল মিছিল বের হয়ে বটতলায় গিয়েছিল। নারীদের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ সেই দিনের জনসভায় উপস্থিত হয়েছিল। এই ভাবে নারীরা স্বাধীনতার জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছে। তাদের এই সাহসী ভূমিকার কথা এখনও জাতি স্মরণ করছে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর দেশব্যাপী যে গণজোয়ার শুরু হয়েছিল সেই গণজোয়ারে নারীরা পিছিয়ে ছিল না। শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত নারীরা তাদের অবস্থান থেকে স্বাধীনতার পক্ষে জেগে উঠেছিল। মুক্তিযোদ্ধারা যখন পাড়া-মহল্লা গ্রামগঞ্জ, শহর-বন্দর থেকে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন, তখন যাওয়ার সময় মা-বোনেরা টাকা-পয়সা, সোনা-দানা দিয়ে সহায়তা করেছিল। বিভিন্ন স্থানে গেরিলা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা হাজির হলে নারীরা তাদের খাওয়া-দাওয়া তথ্য দেওয়া ও বিশ্রামসহ আহতদের সেবা দিয়ে সাহায্য করত। এই ভাবে নারীরা মুক্তিযুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে গিয়ে বহু নারী পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ও রাজাকার আলবদরদের কাছে নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, নারীরা ঝুঁকির মধ্যেও নিজের সন্তানকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। অনেকে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র নিজের কাছে লুকিয়ে রাখেন, আবার কখনো মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন। বৃদ্ধ মহিলারা ভিক্ষুক সেজে পাক হানাদারবাহিনীর ক্যাম্প থেকে তথ্য সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দিতেন। আর ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দলে সেবিকার কাজ করতেন। অনেক নারী আহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন, অস্ত্র চালানো ও গেরিলা ট্রেনিং নিয়েছেন। আবার কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে রান্নার দায়িত্ব পালন করেছেন। এই ভাবে মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলার মায়েরা ও মেয়েরা নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। অবদান রাখতে গিয়ে বাংলার বহু মায়েরা ও মেয়েরা বর্বর হানাদারবাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে নারীদের সাহসী তৎপরতা, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা ছিল। অবশ্য বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর নারী মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা ও তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। অনেকেই দীর্ঘদিন পরে হলেও সরকারের কাছ থেকে এই সহায়তা পেয়েছেন। আবার অনেকের খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছে। এই ভাবে বর্তমান সরকার নারী মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান তুলে ধরে তাদেরকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য কাজ করছেন, যা অন্য কোনো সরকার করেনি। অনেকেই চাকরি, জমি ও বাড়ি পেয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধার কোটায় অনেকের সন্তান চাকরি পেয়েছেন। এখনো প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সার্টিফিকেট প্রদান করে তাদের সন্তান ও নাতি-নাতনীদের চাকরিসহ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

গবেষকের দৃষ্টিতে

৬ দফার ৫০ বছর

সোহরাব হাসান

ভাষা আন্দোলন যদি আমাদের স্বাধীনতার সূতিকাগার হয়, ছয় দফা কালকে বলা যায় ধাত্রীপ্রহর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, ছয় দফার ভেতরেই এক দফা অর্থাৎ স্বাধীনতার বীজ লুকিয়ে ছিল। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যখন ছয় দফা দেন, তখন অন্যান্য বাঙালি রাজনীতিক এর তাৎপর্য অনুধাবন না করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ঠিকই করেছিল। এ কারণে আইয়ুব খান অস্ত্রের ভাষায় ছয় দফার জবাব দিয়েছিলেন, জেলে পুরেছিলেন আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় প্রায় সব নেতাকে। জেল-জুলুম চালিয়েও যখন ছয় দফা আন্দোলন দমন করা যাচ্ছিল না তখন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তথাকথিত আগরতলা মামলা দায়ের করে যার শিরোনাম ছিল, রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য। সেই থেকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে দুটি প্রবল পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নেয়। একটি হলো সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণাপুষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামো এবং অপরটি তার বিপক্ষে বাঙালির মুক্তিসনদ রূপে বর্ণিত ছয় দফা।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ছেষট্টিতে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষিত হয়েছিল সেই লাহোরে, যেখানে ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। এটিকে বাংলাদেশ প্রস্তাবের প্রাথমিক খসড়া হিসেবেও অভিহিত করা যায়।

ছয় দফা কর্মসূচির অর্ধশত বর্ষ উপলক্ষে শিক্ষাবিদ ও গবেষক হারুন অর রশিদ লিখেছেন *আমাদের দাবি ৬ দফার ৫০ বছর*। বর্তমানে দাঁড়িয়ে অতীতের গৌরবের দিকে চোখ ফেরানো একটি বই। ভূমিকায় হারুন অর রশিদ লিখেছেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ (যদিও বাঙালিদের বেলায় ১৯৪৭ সালের লাহোর প্রস্তাবের স্বাধীন রাষ্ট্র ভাবনার বাস্তবায়ন ঘটেনি), ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে ছয় দফার ভূমিকাও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ। এর মর্মস্থলে ছিল বাঙালির জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীন রাষ্ট্রিক ধারণা, যা বঙ্গবন্ধু অনেক দিন থেকেই লালন করে আসছিলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রে আইয়ুব শাসনের গোড়ার দিকে তা মূর্ত হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ছয় দফা কর্মসূচিকে আমাদের বাঁচার দাবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

ছয় দফা কর্মসূচি প্রণয়নের রাজনৈতিক পটভূমি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগণের ন্যায্য অধিকার ও দাবি কখনোই মেনে নেয়নি। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ঢাকায় এসে ঘোষণা দিলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। অথচ পাকিস্তানের মাত্র ৬ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা ছিল উর্দু, আর বাংলা ছিল ৫৬ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা। এরপর পাকিস্তানের মৌলনীতির প্রস্তাবেও বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে কথিত ইসলামি নীতি ও আদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে। অন্যদিকে ১৯৪৮, ১৯৪৯ ও ১৯৫০, ১৯৫১ পেরিয়ে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ২১ ফেব্রুয়ারি এ দেশের তরুণেরা প্রাণ দিয়েই ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এটি শুধু ভাষার আন্দোলন ছিল না, ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারেরও প্রত্যয়।

১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গে সম্মিলিত বিরোধী দলের উদ্যোগে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। তার আগে ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরে মুসলিম শব্দ বাদ দেওয়া হয়) গঠিত হয়, যার সভাপতি হন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ২১ দফায়, পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা ছাড়া সব প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছিল। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯১টি আসন লাভ করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। তারা এ কে ফজলুল হকের সরকারকে বরখাস্ত ও পূর্ববঙ্গে ৯২/ক ধারা জারি করে।

এরপর কেন্দ্রে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হয়। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত সামরিক-বেসামরিক আমলা চক্র রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের ওপর যে হস্তক্ষেপ চালায় তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের মধ্যদিয়ে। তিনি সব রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেন এবং নেতাদের কারারুদ্ধ করেন। এরপর মৌলিক গণতন্ত্রের নামে যে ব্যবস্থা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় সেটি ছিল আসলে একনায়কত্ব।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যখনই নিজের অবস্থান নড়বড়ে মনে করত,

তখনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করত। ১৯৬৪ সালে শাসকগোষ্ঠী প্ররোচিত দাঙ্গার বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তারও অগ্রভাগে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিককর্মী ও সাংবাদিক সমাজ যে মিছিল বের করে, তার প্রধান স্লোগান ছিল, পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও। সেদিন সত্যি সত্যি এ দেশের মানুষ সাম্প্রদায়িকতাকে রুখে দিয়েছিল। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত ও অনিরাপদ। পাকিস্তান নৌ, সেনা ও বিমানবাহিনীর সদর দপ্তর, সেনানিবাস ও স্থাপনা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম সীমান্তে সব শক্তির সমাবেশ ঘটিয়েও পাকিস্তানের শেষ রক্ষা হয়নি। শোচনীয় পরাজয়ের মুখে আইয়ুব খান অস্ত্র বিরতি করতে বাধ্য হন এবং ১৯৬৬ সালের জানুয়ারিতে তাসখন্দে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি সই হয়, যাতে উভয় পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যা সমাধানের ওপর জোর দেয়। এই চুক্তির বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দেয় এবং আইয়ুববিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়। এই প্রেক্ষাপটেই লাহোরে বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করতে চাইলে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা বাধ সাধেন। পরে তিনি সম্মেলন থেকে বেরিয়ে এসে সংবাদ সম্মেলন করে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

১৯৬৬ থেকে ২০১৬ সাল। ৫০ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে এই অঞ্চলের রাজনীতিতে ঘটেছে ব্যাপক পালাবদল। ছয় দফার ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পাকিস্তান শাসকচক্র শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, যার অনিবার্য পরিণতি মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

স্বাধীনতার ৪৫ বছর পর ছয় দফার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। কেননা, ছয় দফার বিরুদ্ধে কেবল পাকিস্তানি রাজনীতিকেরাই অবস্থান নেননি, পূর্ববঙ্গের চরম বাম ও ডানপন্থীরাও কঠোর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু সেই কর্মসূচি জনচিত্তকে ব্যাপকভাবে নাড়া দিয়েছিল, জনগণ এর মধ্যেই পূর্ববঙ্গের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে বলে আশা করেছিল। ছয় দফার কারণেই শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন অপ্রতিদ্বন্দ্বি নেতা। তখন যুদ্ধটা হলো গোটা পশ্চিম পাকিস্তান বনাম শেখ মুজিব। আর ছয় দফাকে রুখতে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করলে গণ-আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। রাজপথে স্লোগান ওঠে জেলের তালা ভাঙব শেখ মুজিবকে আনব। সত্যি সত্যি এ দেশের আন্দোলনকামী মানুষ শেখ মুজিবকে জেলের তালা ভেঙে মুক্ত করেছিলেন। কারাগার থেকে মুক্তির পর তাঁকে বঙ্গবন্ধু শিরোপা দিয়েছিলেন।

সেই ছয় দফার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অধ্যাপক হারুন অর রশিদের *আমাদের দাবি ৬ দফার ৫০ বছর* বইটি নানা কারণে গুরুত্বের দাবি রাখে। বইয়ে ছয় দফার আগের ও পরের ইতিহাসও আছে। তিনি বইটি শুরু করেছেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠার পটভূমি দিয়ে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আইয়ুব শাসনামলের বিচার করেছেন, লেখকের ভাষায় যেখানে বাঙালির স্বাধীনতার ভাবনা স্থায়িত্ব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চাশের-ষাটের দশক নয়, পাকিস্তান আন্দোলন চলাকালেই বাঙালির স্বাধীনতা ভাবনার উন্মেষ ঘটে, কিন্তু পাকিস্তান উন্মাদনা সেটিকে বাস্তবায়িত করতে দেয়নি।

ছয় দফার মূল কথা ছিল:

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদ সার্বভৌম হবে।

২. ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে শুধু দুটি বিষয়, প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক এবং অপর সব বিষয় রাজ্যসমূহের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সমগ্র পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটিই মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে তার ব্যবস্থা সংবলিত সুনির্দিষ্ট বিধি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে।

৪. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের হাতে থাকবে। তবে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে কিংবা উভয়ের স্বীকৃত অন্য কোনো হারে আদায় করা হবে।

৫. দুই অংশের মধ্যে দেশীয় পণ্য বিনিময়ে কোনো শুল্ক ধার্য করা হবে না এবং রাজ্যগুলো যাতে যে-কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে সংবিধানে তার বিধান রাখতে হবে।

৬. প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আধা সামরিক রক্ষীবাহিনী গঠন, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন এবং কেন্দ্রীয় নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করতে হবে।

ছয় দফা লাহোরে উত্থাপনের আগে আওয়ামী লীগের নেতারা এ সম্পর্কে কিছু জানতেন না। লাহোর থেকে ঢাকায় ফিরে বঙ্গবন্ধু দলীয় নির্বাহী কমিটির সভায় উত্থাপন করেন। যদিও এ নিয়ে তিনি অর্থনীতিবিদ, আমলা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের পরামর্শও নিয়েছেন।

'বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়' অধ্যায়ে ড. হারুন অর রশিদ লিখেছেন: পাকিস্তানি শাসক পর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালির জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এগিয়ে চলে। বঙ্গবন্ধু মনে করতেন, পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো ও শাসনব্যবস্থা না ভেঙে বাঙালির সার্বিক মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। সে লক্ষ্যে তাঁর সমগ্র আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল।... ছয় দফা দাবি মোকাবিলায় আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধুকে কেবল কারাগারে নিক্ষেপ করেই শান্ত হয়নি, তাঁকে প্রধান আসামি করে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করে, যার আনুষ্ঠানিক নাম ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য।

বইটি ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এতে ছয় দফার বিশ্লেষণের পাশাপাশি বেশ কিছু দলিলপত্র ও আলোকচিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। সেই সময়ে ছয় দফার জোরালো সমর্থক *ইত্তেফাক* প্রকাশিত বেশ কিছু রিপোর্ট, ছবি ও তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এসব খবর ও তথ্য প্রমাণ করে যে, বাঙালির স্বাধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা ছিল অনন্য। অন্যদের থেকে তিনি এগিয়ে ছিলেন। এ কারণেই ১৯৬৭, ১৯৬৮, ১৯৬৯ সালে যখন অন্যান্য দলের শীর্ষ নেতা বাইরে, তখন শেখ মুজিব জেলখানায়। জেলখানা ছিল তাঁর দ্বিতীয় বাড়ি। পাকিস্তান আমলের ২৪ বছরের প্রায় অর্ধেক সময়ই তাঁর কেটেছে জেলখানায়।

ইতিহাস পাঠ আমাদের কাছে কেবল অতীতকে জানতে নয়, অতীতের ওপর দাঁড়িয়ে যে বর্তমান তার মূল্যায়নের জন্যও জরুরি। ৫০ বছর আগে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিতে যে ন্যায় ও সমতার কথা বলা হয়েছিল, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনে আমরা তার কতটা অর্জন করতে পেরেছি, আমাদের এখন সেই আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন।

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

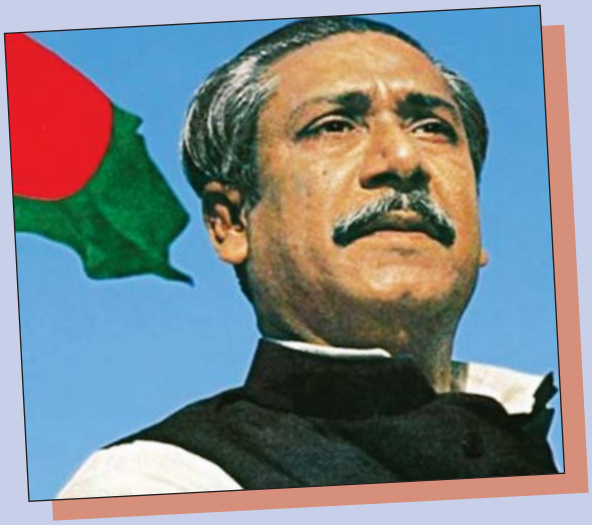

বিশ্বমানবতার মহান বন্ধু

শাফিকুর রাহী

বিশ্বমানবতার মুক্তির অগ্রদূত বাংলার গণমানুষের পরম বন্ধু ভালোবাসার আপন ঠিকানা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর মহান আদর্শে বাঙালি জাতি সমহিমায় বীরের বেশে আলোকিত আগামীর স্বপ্নে দীপ্ত শপথে এগিয়ে চলছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, নারীর ক্ষমতায়নসহ মানবিকতার সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উত্থান আজ বিশ্ব ঈর্ষায় উদ্ভাসিত। সকল কর্মকাণ্ডে প্রশংসিত গৌরবোজ্জ্বল অবদান রেখে চলেছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দৃঢ় প্রত্যয়ে সচেতন নাগরিক সদা জাগ্রত প্রাণ। দেশ-বিদেশে অনেক খ্যাতিমান জ্ঞানী-গুণিরা বলে থাকেন যে, বঙ্গবন্ধুর মতো অমন মহৎপ্রাণ বিশ্বনেতা যুগে যুগে জন্মায় না। তাঁর মতো এমন বীর সন্তানের জন্য বাঙালি জাতিকে হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে। লাখো মানুষের খুনে রক্তাক্ত হয়েছে এ পবিত্র জমিন। কত মানুষের প্রাণবিসর্জনের মহান আত্মত্যাগের বীর মহিমায় উদ্ভাসিত আজ বঙ্গবন্ধুর প্রাণের বাংলা।

কত মা হারিয়েছে তার আদরের ধন, কত বোন হারিয়েছে প্রাণের ভাই, কত পিতা হারিয়েছে বুকের মানিক। এমনিভাবে কতো না আপনহারার কান্নায় বাতাস হয়েছে ভারি আর বারবার রক্তাক্ত হয়েছে বাংলার শ্যামল-কোমল পবিত্র ভূমি। কত ভিনদেশি বেনীয়া বর্গিদের নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে অধিকারহারা বাঙালি জাতিকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি অমর ইতিহাসের নাম, গৌরবোজ্জ্বল অহংকারের নাম। যে নামের তেজদীপ্ত জ্যোতির্ময় আভায় আর সত্য প্রতিষ্ঠার দ্রোহীকণ্ঠে কেঁপে ওঠে তামাম মানবজমিন, অত্যাচারীর শাসন-ত্রাসন-পাষাণ-প্রাচীর। যে নক্ষত্রমণ্ডিত নামের সাথে যোগ হয়েছে অসীম অমরত্বের গৌরবগাথা। যা দুনিয়ার অন্য কোনো দেশের নেতার নামের সাথে অমন গৌরবদীপ্ত কীর্তিগাথা আছে বলে মনে হয় না। বিশ্বের মানব সভ্যতার ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু এক বিস্ময়ের নাম। যা তিনি অর্জন করেছেন স্বল্প সময়ের জীবন সংগ্রামের গর্বিত অধ্যায়ের মধ্যদিয়ে। জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও চরম সত্য উচ্চারণ করে পাকদখলদার স্বৈরশাসকগোষ্ঠীর দুঃশাসনের ভিত কাঁপিয়ে জানান দিলেন বীর বাঙালির অমরত্বের ইতিহাস ঐতিহ্যের মর্মবাণী।

তাঁর গভীর জীবন দর্শনের ভেতর অবগুণ্ঠিত ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা। স্বাধীনতা ও অধিকার আদায়ের অমোঘবাণী আর বিশ্বমানবতার মুক্তির অপ্রতিরোধ্য অভিযানে বারবার তিনি প্রমাণও করেছেন তাঁর উজ্জ্বল তেজদীপ্ত গর্বিত সব অর্জনের ভেতর দিয়ে। তিনি যে মেধা আর প্রবল প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন তা ওই সময়ের বিশ্ব নেতাদের মূল্যায়নেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশ্বসেরা রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা সরকার প্রধানদের সংস্পর্শের এসে বঙ্গবন্ধু সকলের সাথে নানাভাবে বিশ্ব নেতা হিসেবে প্রশংসিত হয়েছেন এবং বিশ্বের অন্যতম প্রধান মানবিক নেতা হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর সমকক্ষ নেতা কালে কালে জন্মায় না। বিশ্ব মনীষীদের এ ধারণা আজো শতভাগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে বিধায় পাক-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে নানাভাবে খাটো করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে এবং বাংলার পবিত্র ভূমিতে সন্ত্রাসী জঙ্গিগোষ্ঠীকে লেলিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবননাশের আদিম লীলায় রক্তাক্ত করে চলেছে নানা অপযুদ্ধের মাধ্যমে গুপ্তঘাতক বেশে মরণঘাতি আঘাতে।

বঙ্গবন্ধু যে মানবপ্রেম ও দেশপ্রেমের অনন্য নজির স্থাপন করেছেন তা বিশ্বে অন্য কোনো নেতার সাথে তাঁর এ দুঃসাহসিক বীরত্বপূর্ণ অনন্য সাধারণ আলোকোজ্জ্বল গর্বগাথা ও আত্মত্যাগের কোনোভাবেই তুলনা করা চলে না। তিনি বিশাল এক উদারতার পরিচয় দিয়েছেন সর্বক্ষেত্রে সকল কাজে। তিনি চরম শত্রুকেও পরম আপন ভেবে বুকে জড়িয়ে মহত্ত্বের যে অপরিমেয় নজির স্থাপন করেছেন তা এখন আর আমাদের কোনো নেতার মাঝে সে আত্মত্যাগী মহৎগুণ লক্ষ করা যায় না। অমন আত্মপ্রত্যয়ী, সত্যবাদী, মানবদরদি নেতা বিশ্বে আজো বিরল। মানুষ রাজনীতি করে দেশ এবং জনগণের কল্যাণে মানবিক তাগিদ অনুভব করে এবং মানবিকতার সকল গুণাবলির মধ্যদিয়ে সে নিজের স্বপ্নকে প্রকাশ করে মানবতার পরম সেবায়। আজ কোথায় সে রাজনীতি? কোথায় সে মহৎপ্রাণ মানুষ? আজকের এসব অস্বাভাবিক অনৈতিক কর্মকাণ্ডের নির্মম স্বীকার হয়ে এদেশের মানুষ আজো বারবার বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শের কাছে ফিরে যায়। শেখ মুজিবুর রহমান যেমন বাঙালির বঙ্গবন্ধু ঠিক তেমনি বিশ্বমানবতার মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে দুনিয়াজুড়ে তাঁর খ্যাতি রয়েছে, তিনি মানবতার পরম বন্ধু। আজো দেশে-বিদেশে তাঁর মহান আদর্শে উজ্জীবিত-অনুপ্রাণিত লক্ষ কোটি মানুষ। বিশ্ববিবেক বিস্মিত হয় বঙ্গবন্ধুর অমর আত্মত্যাগের গর্বিত গরিমায়। মানব সভ্যতার হাজার বছরের ইতিহাসে অমন দূরদর্শী নেতার আবির্ভাব আজো বিরল। এর আগেও বিশ্বনন্দিত অনেক নেতার আলোকিত আগমনে বিশ্ব হয়েছে বিকশিত, যেমন– কার্ল মার্কস, আব্রাহাম লিংকন, জর্জ ওয়াশিংটন, মাহাত্মা গান্ধী, ফ্রেডরিক ডগলাস, মাও সেতুং, জন এফ কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং প্রমুখ। বঙ্গবন্ধুর তেজদীপ্ত বীরত্বপূর্ণ অভিযান ছিল একটি মানবিক কল্যাণময় রাষ্ট্র বিনির্মাণের এক দুঃসাহসিক পথচলার মধ্যদিয়ে। তাঁর দূরদর্শী একক নেতৃত্বের ফলে গণমানুষের মাঝে যে স্বপ্নবীজ বপণ হয়েছিল, তা দ্রুত বিস্তার লাভ করল সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল মুক্তিকামী মানুষের মাঝে। তাঁর সবচেয়ে গৌরবদীপ্ত দিক হলো মাটি ও মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা, বিশ্বাস সত্য ও ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেইতো এদেশের গণমানুষ শেখ সাহেবকে বঙ্গবন্ধু ও জাতির পিতার মহান আসনে প্রতিস্থাপন করেছেন গর্বিত

অহংকারে। মেহনতি কৃষক-শ্রমিকের প্রতি তাঁর পরম মমত্ববোধ, শ্রদ্ধা-ভালোবাসার কারণে তাঁকে কখনো পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তিনি এক অলৌকিক উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোয় পথ চলেছেন, তাতে তিনি বারবার প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁকে অনেক সময় জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখিও দাঁড়াতে হয়েছে। তিনি কাউকে পরোয়া করেননি কারণ তিনি জানতেন, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সত্য ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামে সৃষ্টিকর্তার আশির্বাদ থাকে।

সে আশির্বাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন অর্থাৎ তাঁর ধর্মচিন্তাও ছিল অত্যন্ত সঠিক ও প্রখর। একজন মনীষী কিংবা সৎ ও মহৎপ্রাণ মানুষের যা থাকার দরকার তাঁর সবটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর ভেতর। আজো বিশ্বের দেশে দেশে যেভাবে মানুষ হত্যা, ধনসম্পদ লুণ্ঠনের রামরাজত্ব কায়েম করে চলেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদগোষ্ঠী, এ থেকে উত্তরণের কোনো প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে না বিধায় দিন দিন এ ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ আমরা যখন প্রিন্ট মিডিয়া কিংবা ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ফলে সারাক্ষণই বহির্বিশ্বের নানা ভয়ংকর ধ্বংসযজ্ঞের নির্মম চিত্র দেখে আতংকিত হচ্ছি। লাখো লাখো অসহায় নারী-শিশু শরণার্থীদের বেদনাবিধুর করুণ কান্নায় বেদনাহত হচ্ছি; ঠিক সে মুহূর্তে একাত্তরের পাক দখলদারবাহিনীর গণহত্যার ভয়াবহ দানবীয় ত্রাসের বীভৎসতার বুকভাঙা রোদনধ্বনি বাজতে থাকে এ ক্ষয়ীষ্ণু মানসমাঠে। আজ সিরিয়ার মানচিত্রকে রক্তাক্ত করা হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র থাবায়। রক্তের বন্যায় ভাসছে মানবসভ্যতার সোনালি সোপান। নিরাপত্তাহীন ঘরদোরহারা লাখো মানুষের বেঁচে থাকার মিছিলে নিরীহপ্রাণ নারী-শিশুর আহাজারি বারবার মনে করিয়ে দেয় একাত্তরে বাংলার রক্তাক্ত মাতৃভূমির বীভৎস গণহত্যার নির্মমচিত্র– কোটি মানুষের গৃহত্যাগের অবর্ণনীয় দুঃসহ দুর্গতির অভাবনীয় মানবিক বিপর্যয়ের নির্মম ইতিহাস।

আর বাংলার পরম বন্ধু প্রাণপ্রিয় নেতা পাক কারাগারে অন্ধসেলের ভেতর মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তিনি ঘোষণা করলেন, 'তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলো তবে তোমাদের কাছে আমার শেষ অনুরোধ রইলো আমার লাশটা যেন আমার প্রাণপ্রিয় বাংলার মানুষের কাছে বাংলার মটিতে পাঠিয়ে দিও।' এখানেই উপলব্ধি করা যায়, বাঙালি জাতিকে তিনি কতটা ভালোবাসতেন, কতটা আপন মনে করতেন। আজ আমাদের জাতির পিতা বেঁচে থাকলে বিশ্বের এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবসানের লক্ষ্যে তিনিই সর্বাগ্রে জেগে উঠতেন অবিনাশী তেজে। আজ ভাবতে অবাক লাগে সারাবিশ্বে এমন একজন নেতাও নেই যে অশুভ দানবীয় হিংস্র হায়নাদের উচিত শিক্ষা দেবে? বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলার মেহনতি মানুষের নেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমগ্র দুনিয়ার পীড়িত মানুষের মহান নেতা। তাঁর প্রতি মানুষের এত ভালোবাসা, এত শ্রদ্ধা যা বিশ্বের বিবেকবান বিদগ্ধ মানুষ বহু আগেই টের পেয়েছিলেন বিধায় সারা দুনিয়ার সকল সেরা সেরা রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

তখনকার সকল প্রভাবশালী দেশের নেতারা বিভিন্ন সময় নানাভাবে বঙ্গবন্ধুর প্রশংসা করেছেন এবং অভিনন্দিত করেছেন। অভিবাদন জানিয়েছেন মহৎপ্রাণ বঙ্গবন্ধুর মানবিক গুণাবলি আর উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। তার মধ্যে রয়েছেন তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ, যুগোস্লোভিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল জোসেফ ব্রোজ টিটো, চিলির সরকার প্রধান আলেন্দে, সাউথ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের মহান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, লিবিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মুয়াম্মার গাদ্দাফী, ইরাকের বিপ্লবী নেতা সাদ্দাম হোসেন, কিউবার প্রধানমন্ত্রী ফিদেল কাস্ত্রো, ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রপ্রধান ইয়াসির আরাফাত, মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত, চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, সিরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান হাফিজ আল আসাদ, মালয়েশিয়ার রাজা আব্দুল হালিম, সেনেগালের প্রেসিডেন্ট লিওপোল্ড সেনঘর, সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনসহ আরো অনেকে। বাংলার বঙ্গবন্ধুর সাথে বঙ্গবন্ধুর সেইসব মহান নেতাদের গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তখনকার সব নেতা বঙ্গবন্ধুর নাম শুনলেই যেভাবে শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় কাছে টেনে নিয়েছিলেন তা বর্তমান বিশ্বে বিরল এক উপাখ্যান। তাঁর আপোষহীন নেতৃত্বের কাছে, প্রবল মনোবলের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছে পাকিস্তানি স্বৈরসরকারকে। তাদের সেই দুঃশাসনের বিভীষিকাময় অন্ধকার থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্তির পথ দেখান বঙ্গবন্ধু। ছোটো-বড়ো ভেদাভেদ ভুলে কোটি কণ্ঠে 'জয় বাংলা' আর 'জয় বঙ্গবন্ধু' প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। দিশেহারা হয়ে যায় পাক সামরিকজান্তা। পূর্ব বাংলায় যেমন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানেও তেমনি জননন্দিত নেতা হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন বলেই হয়তো বঙ্গবন্ধু প্রতিটি পদক্ষেপে বিজয়ী বীরবেশে বিশ্ববাসীকে জানান দিলেন বাংলার গণমানুষের মুক্তি ছাড়া মুজিবুর রহমান ঘরে ফিরবে না কখনো। এমন অবিস্মরণীয় প্রতাপশালী দৃঢ়কণ্ঠের অঙ্গীকারে জেগে উঠেছিল বাংলার আপামর জনগণ।

বাংলার বঙ্গবন্ধু আর বিশ্বমানবতার পরম বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন তাঁর বিশাল উদারতা আর মানুষের প্রতি বিশ্বাস– ভালোবাসায়। বাধার সকল আঁধারকে উপেক্ষা করে আপন মহিমায় তিনি আপন টানে এগিয়ে গেছেন মানবতার কল্যাণে। তিনি বিশ্বে একমাত্র নেতা যিনি নিজ জীবন থেকেও মাটি, মানুষকে ভালোবেসেছেন বেশি। সে কারণে তাঁকে বহুবার ফাঁসির কাষ্টে দাঁড়াতে হয়েছে। তবুও কখনো দমে থাকেননি, কোনো অন্যায়ের কাছে মাথানত করেননি কখনো, তাঁকে কেউই দমাতে পারেনি। তিনি ছুটেছেন আপন ইচ্ছায়, আপন মহিমায়। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। বঙ্গবন্ধুর ঋণ বাঙালি জাতি কখনো পরিশোধ করতে পারবে? বাংলার মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে, বাঙালি জাতি তাঁর মহান নেতৃত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আর পরম মমত্ববোধের অমর ইতিহাসের আলোয় পথ চলবে। আমার কাছে সবসময় মনে হয়েছে, বাংলাদেশ মানে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ। কারণ বঙ্গবন্ধুর বিশাল মনাকাশে সারাক্ষণ সারাবেলা মানুষের মুক্তির জয়গান প্রতিধ্বনি হতো, মানুষের সুখ-দুঃখের মর্মবেদনায় কিংবা নির্যাতন-নিপীড়নের মনোকষ্ট তাঁকে সবসময় ভাবাতো ভীষণ।

তিনি সমগ্র বিশ্বে একমাত্র নেতা যাঁর মনাকাশে রয়েছে গণমানুষের মুক্তির ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা, মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা। তাঁর দুঃসাহসী পথচলায়, সমস্ত আন্দোলন সংগ্রামে জনমানুষের সম্পৃক্ততা প্রমাণ করেছে। বঙ্গবন্ধুর যে দূরদর্শী চিন্তা-চেতনা, তাঁর যে বিশাল মন ছিল তা আজো সারা বিশ্বে বিরল। তিনি আমাদের দিয়েছেন একটি মুক্ত স্বাধীন দেশ। আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে, আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। এ গৌরবোজ্জ্বল অমর সোনালি ইতিহাস রচনার জন্য জীবনবাজি সংগ্রামে বহুবার তিনি মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করেছেন। বছরের পর বছর অন্ধকার কারাগারের ভেতর মানবেতর কাল কাটিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু বীর বাঙালির মহান আদর্শের অমর নাম। বঙ্গবন্ধু অনন্তকাল আমাদের উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করবেন, জাগ্রত করবেন মানবিকতার মূল্যবোধকে। শাণিত করবেন বাঙালির দৃষ্টির প্রখরতাকে। তাঁর অমূল্য অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে প্রতিটি সচেতন নাগরিকের মনোলোকে। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি ও সাহস যোগাবে তাঁর অসামান্য বীরত্বপূর্ণ দুঃসাহসিক উজ্জ্বল ভূমিকা। তাঁর সকল চিন্তা-চেতনায় বিপ্লবী পথচলায় বাঙালি জাতি বারবার জেগে উঠবে দেশীয় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীর দানবীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। বাঙালি জাতি ও বিশ্বমানবতার মুক্তির অগ্রদূত আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন সগৌরবে, সমহিমায় অন্তকাল।

লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ

বীরেন মুখার্জী

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন নিঃসন্দেহে। এই অর্জনে বাঙালিকে অনেক কিছুই বিসর্জন দিতে হয়েছে। যা থরে থরে সজ্জিত আছে আমাদের সাহিত্যে। যুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর নির্বিচারে গণহত্যা বাঙালি জাতিকে আরো বেশি সংগ্রাম মুখর করে তোলে। সাহিত্যিকরাও তাদের ক্ষুরধার লেখনিতে তুলে ধরেন পাকিস্তানিদের নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের সেসব চিত্র।

মা রে, তুই ছাড়া আমার কেউ নাই। মা রে কথা কস্‌না ক্যান? হোন্। জানোয়ারে কিছু কইলে হে মনে রাখতে নাই। কুকুর কামড় দিলে কি মানুষে মনে রাখে, না পা কাইট্যা ফেলে? মানুষেরা কিছু কইলে অন্য কথা। জানোয়ারকে মানুষ মাফ কইরা দ্যায়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদারবাহিনীর নারী ধর্ষণের চিত্র এভাবে অংকন করেছেন শওকত ওসমান তার 'ক্ষমাবতী' গল্পে। পাকিস্তানিদের বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, নির্যাতন যে কত ভয়ংকর ছিল তা একাত্তরের নয় মাস যুদ্ধে বাংলাদেশিসহ বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে।

অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, পাকিস্তানি শাসকের শোষণ ও নিপীড়নের জটাজাল থেকে জাতিসত্তা রক্ষা, আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব পুনরুদ্ধারে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল বাঙালি জাতি। '৫২-এ বাংলা ভাষা রক্ষায় বিজয় বাঙালির হৃদয়পটে সাহসের রাজটীকা এঁকে দেয়, যা পৃথিবীর ইতিহাসে এখনো বিরল। আমাদের এ বদ্বীপভূমি মোগল, পাঠান, পর্তুগিজ, ইংরেজ এবং সর্বশেষ পাকিস্তানের শোষণের শিকার হয়। অবশেষে বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের ধারাবাহিক সংগ্রামের পূর্ণতা পায় ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বিজয়ের

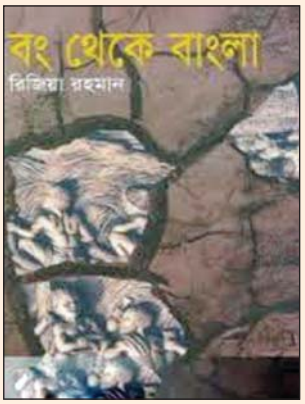

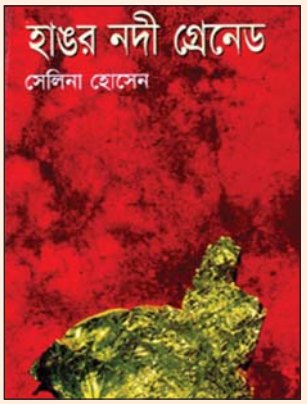

মধ্যদিয়ে। পৃথিবীর মানচিত্রে ঠাঁই পায় লাল-সবুজের পতাকাবাহী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামের এই দেশটি। যুদ্ধের সাফল্য ও গৌরব গাথা একদিকে যুদ্ধোত্তর বাঙালির আর্থসামাজিক মুক্তির নির্দেশক হিসেবে আবির্ভূত এবং বিপরীতে মুক্তিযুদ্ধের ক্লেদ, হতাশা, মুক্তিযুদ্ধোত্তর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, বিজয় আনন্দ বাঙালির মননে নানামুখি আবেগের উল্লম্ফন অনুঘটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সমকালীন প্রেক্ষাপটে আবেগ ও অভিজ্ঞতার মিথস্ক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী আন্দোলন সংগ্রামের ইতিবৃত্ত ও যুদ্ধোত্তর বাস্তবতা সসম্ভ্রমে বিকশিত বাংলাদেশের সাহিত্যে। শিল্পসংবেদনশীল মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন দেশের কবি-সাহিত্যিকগণ এমনকি ভিনদেশি সাহিত্যিকরাও নিষ্ঠার সঙ্গে সেই কাজটি করেছেন। যুদ্ধ-উত্তর পর্বেও সাহিত্যের প্রতিটি শাখা পূর্ণ হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ উপজীব্য করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে যেমন এদেশের স্বাধীনতাকামী আপামর ছাত্রজনতা, সৈনিক, শ্রমিক-কৃষক, শিক্ষক, লেখক, বুদ্ধিজীবী নানাভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, তেমনিভাবে এদেশের কবি-সাহিত্যিকরাও মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা ও পাক হানাদারবাহিনীর বর্বরতার বিরুদ্ধে কলমকে শাণিত রেখেছেন। রচনা করেছেন গান, কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস ও নাটক। এসব সাহিত্যকর্ম একদিকে যেমন যুদ্ধরত বাঙালিকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে অন্যদিকে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকেও করেছে সমৃদ্ধ। 'সাহিত্যের আর এক নাম জীবন সমালোচনা (Criticism of life)। জীবন-সত্যের বিশ্লেষণই এতে অঙ্গীকৃত। মানুষের আবেগ ও মননের (Emotion and Intellect) মাধ্যমে জীবনের সত্য, জীবনাতীতের সত্য ভাষার সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে সাহিত্যে উদ্ভাসিত হয়।' সাহিত্যের দর্পণে যদি প্রতিবিম্বিত হয় একটি জাতি তথা একটি রাষ্ট্রের জীবন প্রণালি। প্রতিফলিত হয় সেই দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি। তাহলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত সাহিত্যকর্মের মধ্যদিয়েও বাঙালি জাতির আপোশহীন সত্তাকে শনাক্ত করা যায়।

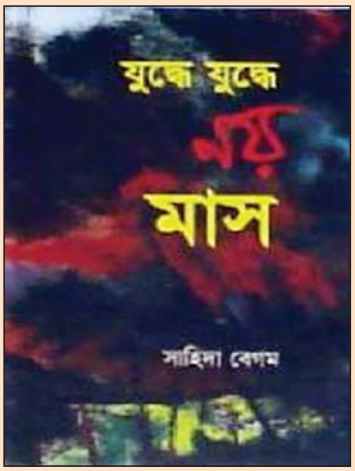

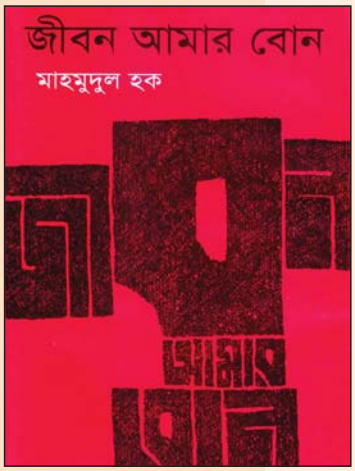

পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞের প্রত্যক্ষ রূপ ধরা পড়ে জসীমউদ্‌দীনের 'দগ্ধগ্রাম' কবিতায়–

কীসে কী হইল, পশ্চিম হতে নরঘাতকেরা আসি
সারা গাঁও ভরি আগুনে জ্বালায়ে হাসিল অট্টহাসি।
মার কোল থেকে শিশুরে কাড়িয়া কাটিল সে খান খান
পিতার সামনে মেয়েরে কাটিয়া করিল রক্তস্নান।
কে কাহার তরে কাঁদিবে কোথায়; যূপকাষ্ঠের গায়,
শত সহস্র পড়িল মানুষ ভীষণ খড়্গ ধায়

মুক্তিযুদ্ধের সময় যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা,

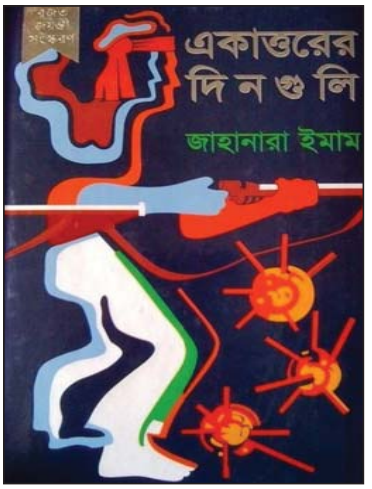

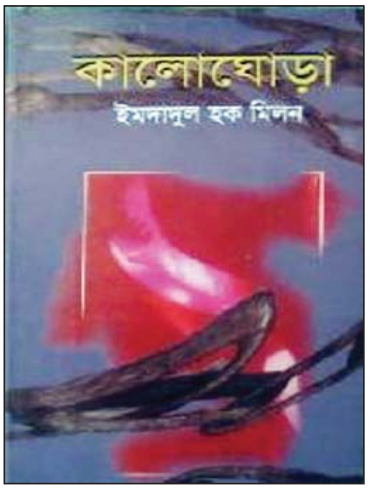

স্বদেশপ্রেম এবং মানবতাবাদী আবেগের স্ফূরণ ঘটেছিল তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কবিতার বিষয়-আঙ্গিককে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন কবিরা। জসীমউদ্‌দীনের 'দগ্ধগ্রাম', সুফিয়া কামালের 'আজকের বাংলাদেশ' ও শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি', নির্মলেন্দু গুণের 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো', রফিক আজাদের 'একজন মুক্তিযোদ্ধার আত্মসমর্পণ', সানাউল হক খানের 'সাতই মার্চ একাত্তর', হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতা সংকলন 'যখন উদ্যত সঙ্গীত', ড. মনিরুজ্জামানের 'শহীদ স্মরণে', অসীম সাহার 'পৃথিবীর সবচেয়ে মর্মঘাতী রক্তপাত', আবুল হাসানের 'উচ্চারণগুলি শোকের', হুমায়ুন কবিরের 'বাংলার কারবালা', আসাদ চৌধুরীর 'রিপোর্ট ১৯৭১', হেলাল হাফিজের 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়', রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'বাতাসে লাশের গন্ধ', মহাদেব সাহার 'ফারুকের মুখ', হেলাল হাফিজের 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়', মিনার মনসুরের 'কী জবাব দেব', আবিদ আজাদের 'এখন যে কবিতাটি লিখব আমি', দাউদ হায়দারের 'বাংলাদেশ', আবিদ আনোয়ারের 'আমার মায়ের নামে তোপধ্বনি চাই'সহ অসংখ্য কবিতায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধে।

১৯৭১ সাল।
আমি পালিয়ে এসেছি আমার দেশ থেকে।
আমার স্ত্রী কোথায়, আমি জানি না। আমার বন্ধুরা
আছে কি নেই, বেতারে সেই উদ্বেগ উচ্চারিত হচ্ছে।
বুদ্ধদেব, আপনার মুখ দর্শনের জন্য আমি এক বিদেশি কূটনীতিকের
ভোজসভায়, অনাহূত বেহায়ার মতো ঢুকে গিয়েছিলাম।
(আল মাহমুদ/বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার)

আল মাহমুদের এই কবিতাটিতে মুক্তিসংগ্রামে এদেশের কোটি কোটি মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার চিত্রই ফুটে উঠেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, যুদ্ধপ্রস্তুতি, যোদ্ধার ভূমিকা, বর্বর পাক হানাদারবাহিনীর নৃশংসতা, নির্যাতন, অবরুদ্ধ বাংলাদেশের মানসিকতা, পাকবাহিনীর দালালি, মুক্তিবাহিনীকে সমর্থন, মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ সংগ্রাম, মহান বিজয়– এসব ঐতিহাসিক সত্যে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা কবিতা। প্রজন্মের কবিরাও সগর্বে তাদের সাম্প্রতিক কবিতায় তুলে ধরতে সচেষ্ট রয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের বীরত্ব ও দুঃখ গাঁথা। ১৯৭১ সালে ভিনদেশি কবিরাও বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম ও পাক হানাদারবাহিনীর বীভৎসতা নিয়ে রচনা করেছেন উল্লেখযোগ্য কবিতা। মার্কিন কবি অ্যালেন গ্রিন্সবার্গের 'যশোর রোডে সেপ্টেম্বর' কবিতা এবং জর্জ হ্যারিসনের 'ও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ' গানের কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এ দুটি রচনায় মুক্তিযুদ্ধে জনদুর্ভোগের প্রকৃত চিত্র এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মত্যাগ ও মহিমা ফুটে উঠেছে সর্বতোভাবে।

বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষ করে ছোটোগল্পে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপক প্রতিফলন লক্ষণীয়। সৃজনশীলতার প্রশ্নে একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত থাকায় আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মুক্তির স্বার্থে নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উজিয়েও অপরাপর ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সংগ্রামের সোপানতলে একীভূত হয়েছে–অস্তিত্বের লড়াইয়ে। বিভিন্ন সময়ে ঔপনিবেশিক শক্তির দীর্ঘ ও ধারাবাহিক শাসন-শোষণে ভঙ্গুর আর্থসামাজিক অবস্থায় নিমজ্জিত বাঙালির মধ্যবিত্ত মানস যুদ্ধকালীন সময়ে দুটি বিপরীতমুখী দর্শন অবলম্বন করে স্পষ্ট হয়। প্রথমত ধর্মীয় ভীরুতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ ও তোষণের সনাতন রূপ এবং দ্বিতীয়ত সমস্ত পঙ্কিলতা ও সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তীর্ণ হবার চেতনা। প্রথম ধারার সমর্থকরা সত্য ও যুক্তিনিষ্ঠ দ্বিতীয় ধারার বিপরীতে অবস্থান করলেও ঘটনার প্রবহমানতা ও প্রতিক্রিয়ায় একসময় মুক্তিকামী চেতনায় মিলিত হয়। মানবিক উন্নয়ন ঘটে। ব্যক্তির অভিজ্ঞানসঞ্জাত, মর্মস্পর্শী উপলব্ধি নিয়ে বশীর আল হেলাল- এর গল্প 'প্রথম কৃষ্ণচূড়া'। পাকবাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে ঢাকা শহরের অর্ধেক মানুষ শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গোলাম রসুল তার পরিবারকে গ্রামে পাঠিয়ে দেয়। শিক্ষকের তরুণ পুত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে আগ্রহী হলেও পিতার অনুমতি পায়নি। কিন্তু ঢাকা শহরে অবস্থান ও প্রতিদিন নির্যাতন, হত্যা প্রত্যক্ষ করে তার বিদ্রোহী সত্তার জাগরণ ঘটে। বয়সের ভারে নিজে যুদ্ধে যেতে না পারলেও ওই শিক্ষক পুত্রকে চিঠি লিখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেয়। একই গল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গোলাম রসুলের মতো আরেক সরকারি চাকুরে হায়দার পাকবাহিনীর নির্মমতা প্রত্যক্ষ করে একসময় হায়দার ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একরাতে হানাদারবাহিনীর এদেশীয় দোসররা তাকে দরজা খুলে দিতে বললে হায়দার পেছন দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী মজাপুকুরের গলাপানিতে নিমজ্জিত থেকে সকালে ফিরে আসে। বাসায় ফিরে হায়দার আলী দেখে তার যুবতী মেয়ে জাহানারা, বাসার কাজের ঝি ও অন্য একজন অপরিচিত নারী খাটের ওপর রক্তাক্ত, বিবস্ত্র। এ দৃশ্য দেখে হায়দার আলীও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

হানাদারবাহিনীর মানবতা বিরোধী হত্যা-নির্যাতন ও দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে যুদ্ধে অংশ নেওয়া এক যুবকের বীরত্বগাঁথা নিয়ে রচিত জহির রায়হানের শ্রেষ্ঠ গল্প 'সময়ের প্রয়োজনে'। গল্পের মুক্তিযোদ্ধা চরিত্রের যুবক জীবনত্যাগী বীর সহযোদ্ধাদের কথা ভেবে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে আবার একই সঙ্গে পাকবাহিনীকে হত্যা করে উল্লাসে ফেটে পড়ে। গল্পের চূড়ান্ত পর্যায়ে সে পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে নিজের জীবনও উৎসর্গ করে। তবে ধরা পড়ার পূর্বে সে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করে। গল্পটি একজন মুক্তিযোদ্ধার দিনলিপি হিসেবে ধরা যায়। বাঙালি জাতি সেদিন কোনো সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্যে লড়েছে? বর্তমানের বাস্তবতায় দ্বিধান্বিত জাতির সামনে সেই সত্যটিই কি নানা মাত্রিকতা নিয়ে দৃশ্যমান নয়? গল্পটিতে লেখকের শক্তিমত্তা

পূর্ণমাত্রায় সমর্থনযোগ্য। আবেগী, তারল্যপূর্ণ লেখকদের মতো মুক্তিযুদ্ধকে তিনি শুধু নারী লাঞ্ছনা হিসেবে দেখেননি। পাকসেনা ও এদেশীয় বর্বরদের যৌনলিপ্সা যুদ্ধখণ্ডের একটি প্রপঞ্চমাত্র। যে বাস্তবতা, কাঙ্ক্ষা নিয়ে একাত্তরের যুদ্ধে অংশ নেয় সাধারণ জনতা, তার মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন গল্পটিতে পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত।

প্রায় সমজাতীয় বাস্তবতা নিয়ে রচিত হারুন হাবীবের 'লাল শার্ট' গল্পটি। কামালপুর নামের এক অখ্যাত অঞ্চলের রণক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থা এ গল্পে পূর্ণরূপে ফুটে ওঠে। এলাকার পাকিস্তানি ঘাঁটির নিকটবর্তী মুক্তিযোদ্ধাদের বাঙ্কার পাহারারত জলিল, সতীশ ও মোতালেব নামের তিন মুক্তিযোদ্ধার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে এ গল্পে। পাকসেনারা বাঙ্কার আক্রমণ করলে তিনজনের একজনও ফিরে আসে না। পরদিন খুঁজতে গিয়ে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় এক বাঁশঝাড়ের মধ্যে স্থির বসে থাকতে দেখে সহযোদ্ধা তাহের। ওই আক্রমণে সতীশ ও মোতালেব নিহত হয়। জলিল আহত হলেও মৃত দুই সহযোদ্ধার অস্ত্র দুটি যুদ্ধের কাজে লাগবে বলে সে সঙ্গে নিয়ে আসে। জলিলও ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগুতে থাকে। এ সময় তার মনে পড়ে মা আর বোনের কথা। যাদের না বলে সে যুদ্ধে অংশ নেয়। স্বাধীনতা প্রত্যাশায় জীবন উৎসর্গকারী এই যুবক যোদ্ধা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও নিহত সহযোদ্ধাদের অস্ত্র, তাদের রক্তাক্ত লাল শার্টের ছেঁড়া অংশ বহন করে দেশমাতৃকার প্রতি অগাধ ভালোবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ দেশমাতৃকার সম্মানই গল্পে নিঁখুতভাবে উঠে আসে।

হাসান আজিজুল হকের 'আটক' গল্পটি যুদ্ধখণ্ডের আরেক বাস্তবতা নিয়ে বিকশিত। মিত্রবাহিনীর সঙ্গে বাঙালি যোদ্ধাদের সম্মিলিত আক্রমণে দিশেহারা পাকসেনারা। রাতের আঁধারে তাদের পশ্চাদপসরণ নিখুঁতভাবে বিবৃত হয়েছে। তার 'ভূষণের একদিন' গল্পে পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচার-নির্যাতনে বাঙালির বিধ্বস্ত জীবনের চিত্র ও বাংলার প্রত্যন্ত জনপদের বিবর্ণ ছবি ফুটে ওঠে। গল্পে তিনি যুদ্ধ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরের বাস্তব অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। 'নামহীন গোত্রহীন' গল্পটি বিকশিত হয়েছে থমথমে ও ভয়াবহ পরিস্থিতিকে সামনে রেখে। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর লোমহর্ষক বর্বরতার ছবি তিনি এ গল্পে শিল্পসম্মতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'সে' নামের এক চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে। গল্পটি মুক্তিযুদ্ধ প্রেক্ষাপটে রচিত অপরাপর গল্পের ভেতর ভিন্নতা নির্দেশক।

বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন 'মুক্তিযুদ্ধের বিজয়' বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছে একথাও সত্য। কিন্তু এরজন্যে বাঙালি জাতিকে যা হারাতে হয়েছে তার পরিমাণও নিতান্ত কম নয়। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত ছোটো গল্পগুলোতে বিজয়ের পাশাপাশি বেদনারও ভয়াবহ চিত্র অংকিত হয়েছে। বিজয়ী বেশে মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন দেশের মাটিতে ফিরে এলেও তাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে নিষ্ঠুর বাস্তবতার। ভয়াবহ যুদ্ধের কারণে মা হারিয়েছে সন্তান, নারীরা বিসর্জন দিয়েছে সম্ভ্রম, প্রিয়জনের মৃতদেহ মাড়িয়েও যুদ্ধ করতে হয়েছে সতীর্থ যোদ্ধাদের। নিজ জন্মভূমি ছেড়ে উদ্বাস্তু, উন্মুল হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়েছে সাধারণ মানুষদের। গল্পগুলোতে এসব মানুষেরও অসহায়ত্বের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ফুটে উঠেছে মানবিক সকরুণ আর্তি। সেলিনা হোসেন তার 'পরজন্ম' গল্পে যুদ্ধ যন্ত্রণায় নিঃসঙ্গ ও বেদনাজর্জর এক পিতার করুণ আর্তি তুলে ধরেছেন। বৃদ্ধ কাজেম আলীর মুক্তিযোদ্ধা চার সন্তান এক অপারেশনে গিয়ে পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। তার চোখের সামনেই পাকসেনারা তাদের গুলি করে হত্যা করে। স্বাধীনতার পর নিঃসঙ্গ কাজেম আলীর স্ত্রী পুত্রশোকে মারা গেলে বৃদ্ধ কাজেম আলী আরো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে।

হরিপদ দত্ত'র বাস্তব সত্যদর্শন 'কাকজোছনার বনপুদিনা' গল্পটি। মুক্তিযুদ্ধকে নিকট থেকে দেখার অভিজ্ঞতা এবং গল্পে বিবৃত সত্য ঘটনাটি তিনি সৃজনশীল চেতনার মিশেলে শিল্পঋদ্ধ ফসল হিসেবে উপস্থাপন করেন। যুদ্ধে ধর্মীয় ভীরুতা ও আখের গোছাতে উৎসাহী এক অর্থলিপ্সু অধ্যাপক পিতা ও যুদ্ধ শেষে পাকক্যাম্প থেকে ফিরে আসা কন্যার বেদনাদায়ক সংলাপ গল্পের চুম্বকীয় অংশ হিসেবে গল্পটিকে বিশিষ্টতা দান করে। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি নিয়ে লিখিত এটি একটি সার্থক ছোটোগল্প।

ছোটোগল্প লেখকরা নানারৈখিক চিত্র অংকনের মধ্যদিয়ে মুক্তিযুদ্ধের গল্পগুলোকে মাত্রিক, ব্যঞ্জনা ঋদ্ধ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকসেনা কর্তৃক নারী ধর্ষণের চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি তুলে ধরেছেন বাঙালি নারীর গুপ্তচরবৃত্তির সফল কাহিনি। নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচাতে পাকসেনাদের নিষ্ঠুরতা মেনে নিয়েছে আবার বিষধর ছোবল দিয়েও তাদের প্রাণসংহারে ব্রতী হয়েছে। পাকসেনাদের নির্যাতনে অন্তঃসত্ত্বা এবং সন্তান প্রসব করে মাতৃত্বের অপমানের প্রতিশোধ হিসেবে সেই সন্তানকে মেরে ফেলার দৃশ্যও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের গল্পে। শক্তিশালী গল্পকার শওকত ওসমান 'দ্বিতীয় অভিসার' গল্পে এইভাবে বাঙালি নারীর প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তিকেই সফলভাবে চিত্রায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের আবেগ, উপলব্ধি, তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা গল্পগুলোর নিবিড় পাঠে দৃশ্যমান হয়। প্রাগুক্ত গল্পগুলোতে চিত্রায়িত হতে দেখি যুদ্ধখণ্ডে বাঙালির নিজস্ব উপলব্ধি। ফুটে ওঠে স্বাধিকার প্রশ্নে আত্মোৎসর্গকারী জনতার নির্লোভ মুখ। বিবৃত হয় এদেশীয় স্বাধীনতা বিরোধী ও পাক হানাদারবাহিনীর যৌথ যৌনলিপ্সা। অপরাপর ব্যথায় কুঁকড়ে ওঠে সম্ভ্রম হারানো নারীর হৃদয়। লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও শক্তিশালী কল্পনার মিশেলে পুষ্ট গল্পগুলো আবেগসঞ্চারী বাক্যবিন্যাসে মূর্ত হয়ে ধরা দেয় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত যাবতীয় হতাশা, দীর্ঘশ্বাস, আশা, প্রাপ্তিসহ নানাবিধ প্রপঞ্চ। লেখকের

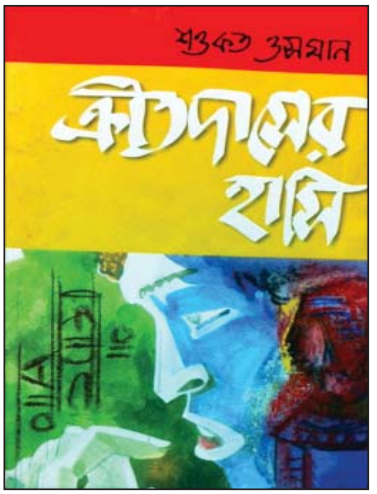

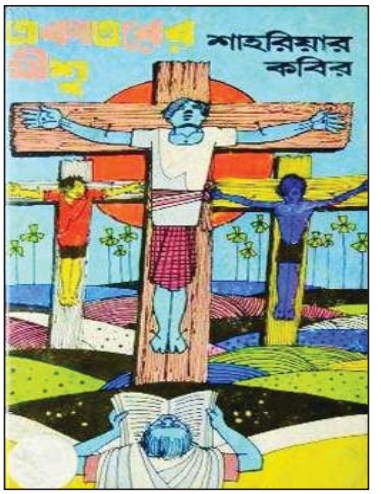

শক্তিমত্তা, বুননশৈলীতে শব্দচিত্রে ভাস্বর হয় অসহায়-অনাহারী আমজনতার দীর্ঘশ্বাস ও দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। গল্পে বিবৃত ঘটনারাশি তাই পারস্পরিক সহমতের নিরিখে স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি করে পাঠক চেতনায়। গল্পগুলোতে অঙ্কিত বিভিন্ন চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি ঘটনা পরম্পরায় মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস হয়ে ওঠার দাবি রাখে।

এছাড়া শওকত ওসমান- এর 'দুই ব্রিগেডিয়ার', 'ক্ষমাবতী', 'জননী: জন্মভূমি', 'দ্বিতীয় অভিসার', বশীর আল হেলাল- এর 'প্রথম কৃষ্ণচূড়া', 'রণকৌশল', জহির রায়হান- এর 'সময়ের প্রয়োজনে', আবু জাফর শামসুদ্দীন এর 'ছাড় দেয়াল', 'চাঁদমারি', হাসান আজিজুল হক- এর 'নামহীন গোত্রহীন', 'রাফি', 'কৃষ্ণপক্ষের দিন', 'আটক', কায়েস আহমেদ এর 'নচিকেতাগণ', 'বাংলাদেশ কথা কয়', মঈনুল আহসান সাবের এর 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প', শাহরিয়ার কবির- এর 'একাত্তরের যীশু', আখতারুজ্জামান ইলিয়াস- এর 'অপঘাত', মাহমুদুল হক- এর 'বেওয়ারিশ লাশ', 'কালো মাফলার', আলাউদ্দিন আল আজাদ- এর 'আমাকে একটি ফুল দাও', হরিপদ দত্ত এর 'কাকজোছনার বনপুদিনা', সেলিনা হোসেন- এর 'পরজন্ম', হারুন হাবীব- এর 'লাল শার্ট', কাজী ফজলুর রহমান– এর '২৫শে মার্চ' গল্পগুলো সন্ধানী পাঠশেষে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত সার্থক ছোটোগল্প হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

অস্বীকার করা যাবে না, যুদ্ধ মানে ধ্বংস আর মৃত্যুর বিভীষিকা। তারপরও যুদ্ধ মানেই মুক্তি-শান্তি এবং যুদ্ধ মানেই স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির একটি ঐতিহাসিক বেদনাবিধূর অধ্যায় আবার সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জনও। কিন্তু আমাদের মতো দরিদ্র দেশগুলোর ওপর যুদ্ধের ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। জাতীয় অর্থনীতিতে ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায়। একথাও সত্য যে, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই বিজয়ে আমাদের চেতনাও হয়েছে শাণিত। গতিশীল হয়েছে সাহিত্য। মুক্তিযুদ্ধের আগে পরাধীনতার নিগড়ে বাঁধা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এসে শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃতি ঘটেছে। ধ্বংসের বিপন্ন তিমির থেকে সাহিত্যের সত্তার পুনজাগরণ ঘটেছে। মুক্তিযুদ্ধ সাহিত্যিকদের লক্ষ্য নিরূপণে সহায়তা করেছে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো উপন্যাসেও মুক্তিযুদ্ধ উঠে এসেছে পাকবাহিনীর নারকীয় হত্যা, নির্যাতন, জুলুম এবং তা থেকে বাঙালির উত্তরণের ধারা পরিগ্রহ করে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সবচেয়ে ব্যঞ্জনাময় উপন্যাস শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি'। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের মানুষের বঞ্চনা, ক্রোধ, আবেগ, ভীরুতা, প্রেম-কাম সর্বতোভাবে ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসে। শওকত ওসমান এ উপন্যাসে প্রতীকী অর্থে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক, শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক ব্যাখা করেছেন। 'নেকড়ে অরণ্য' উপন্যাসে দেখানে হয়েছে পাক হানাদারবাহিনী কী করে একটি অন্ধকার গোডাউনে শতাধিক নারীকে রাতদিন উলঙ্গ করে রাখত এবং একের পর এক ধর্ষণ করত। এ উপন্যাসটিতে নারী নির্যাতনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। শহিদ আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত'-এর মূল চরিত্র সুদীপ্ত শাহীন। যে সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কহীন। তার যুদ্ধজীবন অনেকটা ঝুঁকি গ্রহণের মতো, কিছুটা স্বতঃস্ফূর্তও। সে যখন বলে, 'মরে যাওয়া অত সহজ নয়। মেরে ফেলা তো আরো কঠিন। তুমি কাকে মারবে? হ্যাঁ তো, সহাস্য প্রাণের সেই দীপ্ত পাপড়ি– একচুলও মরেনি।' তখন একজন সংবেদনশীল ন্যায়বোধসম্পন্ন মানুষকে পাওয়া যায়। যে নিজের জীবনের ঝুঁণি থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। একইভাবে শওকত আলীর 'যাত্রা', জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি', রশীদ হায়দারের 'খাঁচায়', সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড', মাহবুবুল হকের 'জীবন আমার বোন', রিজিয়া রহমানের 'বং থেকে বাংলা', রাবেয়া খাতুনের 'মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী', শাহিদা খাতুনের 'যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস', জোবাইদা গুলশান আরার 'সুবাস ফেরেনি', হাসনাত আব্দুল হাইয়ের 'নিখোঁজ', রফিকুন্নবীর 'পিস্তল', মঈনুল আহসান সাবেরের 'সতের বছর পর', রশীদ হায়দারের 'নদী ও বাতাসের খেলা', হুমায়ূন আহমেদের 'নন্দিত নরকে', 'নির্বাসন', 'জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প' এবং ইমদাদুল হক মিলনের 'কালো ঘোড়া', সালাম সালেহ উদ্দীনের 'ছায়াশরীর'সহ বহু উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যেমন নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্র তেমনি রচিত হয়েছে মঞ্চনাটক। আনিস চৌধুরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, মমতাজ হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, ফজলুল করিম, আসকার ইবনে শাইখ, মামুনুর রশীদ প্রমুখ নাট্যকারগণ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রাণস্পর্শী সব নাটক রচনা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের যে চেতনার দুয়ার খুলে দিয়েছে তাতে সাহিত্যেও ব্যাপক প্রাণসঞ্চার ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় মুক্তিযুদ্ধ মিশে আছে অপার নির্ভরতায়, আনন্দ-বেদনার মহাকাব্য হিসেবে।

তথ্যসূত্র

১. মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ছোটোগল্প, মুহম্মদ হায়দার, বাংলা একাডেমি, মে ২০০৩

২. মুক্তিযুদ্ধের কবিতা, সম্পাদনা চন্দন চৌধুরী, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, একুশে বইমেলা ২০০৯

৩. বাংলাদেশের ছোটোগল্প (গবেষণা গ্রন্থ), খালেদা হানুম, চট্টগ্রাম

৪. কবির অন্তর্লোক ও অন্যান্য প্রবন্ধ, বীরেন মুখার্জী, কলি প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১২

৫. বাংলা কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ (প্রবন্ধ), ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

৬. বাংলাদেশের কবিতায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিফলন (প্রবন্ধ), সাঈদ-উর-রহমান

৭. সাহিত্যে দশক বিভাজন ও অন্যান্য, মোহাম্মদ নূরুল হক, আশ্চর্য মেঘদল, বইমেলা ২০১১

লেখক : *কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক।*

বাড়ি ফেরার অপেৰা

কনক চৌধুরী

বেশ রাত। মফস্বল শহরে বিজলিবাতি তখনো তেমন লাগেনি। তবে রাতের বেলা শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলোতে বাতি জ্বললেও বাকি রাস্তাঘাটে আঁধার ঘিরে থাকে। এসব জায়গায় রাত নয়টা–দশটা বাজতে না বাজতেই হয়ে যায় যেন গভীর রাত। এ অন্ধকার পথে সাপের ভয় থাকে। সে কারণে কাউকে বাইরে কোথাও যেতে হলে হারিকেন অথবা চেরাগ নিয়ে বের হতে হয়। কোনো কোনো বাড়িতে টর্চলাইট থাকলেও তার ব্যবহার খুব একটা দেখা যায় না। ড্রাইসেল ব্যাটারির দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে না থাকায় এটা লাক্সারি পণ্যের মধ্যেই পড়ে।

হালিম একটা হারিকেন নিয়ে প্রতিবেশী এবং গ্রাম সম্পর্কীয় ফুফুর সাথে দেখা করেতে যায়। রাত পোহালেই সে তার কর্মস্থল চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। পুলিশের চাকরিতে তার পোস্টিং এখন চট্টগ্রাম পুলিশ লাইনে। ছুটিতে বাড়ি এলে পাড়াপ্রতিবেশীর সাথে দেখাসাক্ষাৎ করে সে। আবার চাকরিতে ফেরত যাওয়ার আগেও সে তার ভালো লাগা মানুষদের সাথে দেখা করে বিদায় নিয়ে যায়। এবারো সে তার ফুফুর সাথে দেখা করতে আসে।

হালিমের পুরা নাম কাজী আবদুল হালিম। জন্ম বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার কমলাপুর গ্রামে। তার পিতা কাজী আবদুল গফুর ও মাতা মোছাম্মৎ রূপজান খাতুন। সে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে একজন কনস্টেবল হিসেবে পুলিশবাহিনীতে যোগদান করে। প্রথমে রাজশাহীর সারদায় অবস্থিত পুলিশ টেনিং সেন্টার থেকে টেনিং গ্রহণ শেষে যশোর জেলায় তার পোস্টিং হয়। কিছুদিনের মধ্যে তাকে চট্টগ্রাম বন্দরে বদলি করা হয়। সেখানে কিছুদিন চাকরি করার পর সে নায়েক পদে উন্নীত হয়। তার শেষ পোস্টিং হয় চট্টগ্রাম পুলিশ লাইনে যা চট্টগ্রামের দামপাড়ায় অবস্থিত। মা রূপজান খাতুন ছেলের কর্ম ও কর্মস্থল সম্পর্কে এটুকুই বলতে পারে। আর ছেলে চিঠিতে লিখেছিল– কুসমীর স্বামী খবির ভাইয়ের সাথে তার কর্মস্থলে দেখা। সেও তারই সাথে এখানেই চাকরি করে। কুসমীও তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে কাছেই একটি ভাড়া বাসায় থাকে।

বাবা তাকে আবদুল বলে ডাকলেও মা, ভাইবোন ও গ্রামের লোকে তাকে হালিম নামে ডাকে। হালিমের বাবা সামান্য রোজগেরে

লোক ছিল। বছর কয়েক আগে এক রাতে সে ঘুমানোর আগে শুয়ে শুয়ে পান খাচ্ছিল। হঠাৎ করেই সে পান তার গলায় আটকে যায় এবং হাসপাতালে নেওয়ার আগেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সে মারা যায়।

বাবার মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবে তাদের আর্থিক অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পরে। মা-বাবা, দুই ভাই ও এক বোনকে নিয়ে তাদের সংসার। বোন বড়ো, তারপর ভাই দেলোয়ার আর সবার ছোটো হালিম। কিছুদিন হয় বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। দেলোয়ার লেখাপড়া ছেড়ে বাসের কন্ডাক্টরির কাজ করে। কিছুদিন আগে বিয়ে করেছে। তারপর থেকে দেলোয়ার বউ নিয়ে আলাদা থাকে। এখন সংসার বলতে হালিম আর মা।

হালিমদের বাড়ির পাশেই তার ফুফুর বাড়ি। বাড়িটি বেশ বড়ো, কয়েক বিঘা জমির উপর সেটি অবস্থিত। একদিন সে ওই বাড়ির বাগানের একটি বড়ো গাছ থেকে একটি ঘুঘু শিকার করে। ঘুঘুটি সে বাড়ি নিয়ে যায়। একটু পরে সে পাখিটি নিয়ে তার ফুফুর কাছে এসে বলে, 'ফুফু, আপনে কি ঘুঘু নিবেন?'

'কেন রে! কি হয়েছে? তুই না পাখি নিয়ে বাড়ি গেলি?'

'বাড়িতে যে মশলা নেই। তাই মা বললো, তোর ফুফুকে দিয়ে আয়।'

ফুফু জানে হালিমদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। সে বলে, 'তোর মাকে আসতে বল। কি মশলা লাগবে নিয়ে যাবে আর তুইও পাখি বাড়ি নিয়ে যা।'

এটা নতুন কিছু নয়। অনেক সময় বাড়িতে তরকারির টান পরলে বা না থাকলে হালিমের মা এসে হালিমের জন্য একটুআধটু তরকারি নিয়ে যায়। হালিমের স্বভাবচরিত্রের কারণে তার ফুফু তাকে ভালোই জানে।

অভাব–অভিযোগে দিন যেন আর চলতে চায় না। একদিন বাধ্য হয়ে মা হালিমকে একটা কাজ খুঁজতে বলে। তারপর একদিন হালিম তার স্কুলের পাঠ চুকিয়ে দিয়ে কাজের সন্ধানে নামে। এভাবে কিছুদিন কাটে। এরই মধ্যে হালিম গায়ে-পায়ে বড়ো হয়ে ওঠে। তাদের বাড়ি থেকে পুলিশ লাইন বেশি দূরে নয়। একদিন সে শুনতে পায় পুলিশবাহিনীতে লোক নেওয়া হচ্ছে। চাকরি খুঁজতে আসা লোকজন খালি গায়ে লাইন করে দাঁড়িয়েছে। বাছাই কমিটির প্রধান তাদের শরীর স্বাস্থ্য দেখে যাদের পছন্দ হচ্ছে তাদের বুকে একটি দাগ দিয়ে পাশের লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে বলছে। হালিম গিয়ে প্রাথমিক বাছাই লাইনে দাঁড়ায়। তাকে দেখে বাছাই কমিটির প্রধান তার বুকে একটি দাগ দিয়ে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত সারিতে গিয়ে দাঁড়াতে বলে। পরে তাদের মৌখিক পরীক্ষা হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। সে সার্টিফিকেট হালিমের ছিল। মৌখিক পরীক্ষায়ও সে টিকে যায়।

মানুষ বাস্তবাদীই হবে আর এটাই হয়। কিন্তু আবেগ-অনুভূতিকে সবসময় সামলে চলা যায় না। হালিমও এর ব্যাতিক্রম নয়। তবু সে মাঝেমধ্যে রেনুকে কল্পনা করে গুনগুন করে গান গায়।

১৯৭১ সাল। ৩ মার্চ ঢাকায় ডাকা অ্যাসেম্বলি ভণ্ডুল করে দেয় পাকিস্তানের সামরিক জান্তা জেনারেল ইয়াহিয়া খান। জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পিপিপি আওয়ামী লীগের সাথে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেতে ব্যর্থ হয়। বাঙালি হয়ে শেখ মুজিব দুই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবে এটা সে মেনে নিতে পারেনি। পর্দার অন্তরালে সে কলকাঠি নাড়াতে শুরু করে যাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্যাবিনেট গঠন করতে না পারে এবং ক্ষমতা না পায়।

এত সব তালবাহানা ও চক্রান্তের প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন যা বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অর্জনে মাইলফলক হয়ে আছে। বাঙালির কাছে দুটি জিনিস মিলে যেন একাকার হয়ে গেছে তাহলো, ঐতিহাসিক ভাষণ মানেই ৭ মার্চ আর ৭ মার্চ মানেই ঐতিহাসিক ভাষণ। ৭ মার্চ গত হয়, শংকা বাড়ে, উদ্বিগ্ন হয় জাতি। তারপর আসে ২৫ মার্চ রাত, কালরাত। সে রাতে পাকিস্তান হানাদারবহিনী নিরস্ত্র বাঙালি নিধনে মেতে উঠে। অস্ত্র জমা নিয়ে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয় ২ ও ১০ নং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে। ওরা আক্রমণ চালায় রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পুলিশবাহিনীর উপর। আক্রান্ত হয় পিলখানার ইপিআর অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। অগ্নিসংযোগ করা হয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভবনে।

সে রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর নিজ বাসভবন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসা থেকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর কারাগারে পাঠানো হয়। বাঙালি যুদ্ধে নামে।

খবির বিয়ে করেছে হালিমদের গ্রামের মেয়ে কুসমীকে। এ সুবাদে হালিম- খবিরকে বোন জামাই বলে সম্বোধন করে। তার পোস্টিংও ছিল একই জায়গায় অর্থাৎ চট্টগ্রাম দামপাড়া পুলিশ লাইনে। হঠাৎ সন্ধ্যায় ২ এপ্রিল, ১৯৭১ সে কুসমী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে আসে। খবিরদের বাড়ি কমলাপুর থেকে আরো ভেতরে। সেখানে যেতে আরো কয়েকঘন্টা লাগবে। তারপর তারা রাস্তা ভেঙে ভেঙে পালিয়ে আসে। পথে পথে ভয়। সে যদি পাকিস্তানবাহিনী বা তাদের দোসরদের হাতে ধরা পরে, আর সে পুলিশবাহিনীর সদস্য এবং পালিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারে তাহলে তার জীবনের ঝুঁকি আছে। এসব টেনশন ও পথচলার ধকলের কারণে সে ক্লান্ত ও অবসন্ন। তারপর বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে নিজ বাড়িতে যেতেও অনেক রাত হয়ে যাবে বলে সে শ্বশুরবাড়িতেই এসে ওঠে।

তার চট্টগ্রাম থেকে বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে পালিয়ে আসার সংবাদ এলাকাতে ছড়িয়ে পরে। গ্রামের অনেকেই তার কাছে গিয়ে জানতে চায় চট্টগ্রামের অবস্থা কি, আসার পথে সে কি পাকিস্তানবাহিনী দেখেছে, তাদের ওখান থেকে কি সবাই পালিয়ে গেছে, এমন অনেক অনেক প্রশ্ন।

তার পালিয়ে আসার সংবাদ রূপজান খাতুন শুনতে পেয়ে হালিমের খবর জানতে সে তার কাছে ছুটে যায়। খবির তাকে বলে যে সে চলে আসার সময় হালিমের সাথে তার দেখা হয়নি। তবে দেখা হয়েছিল দুএকদিন আগে। সে হালিমকে বলেছিল সে বাড়ি চলে যাবে এবং তাকেও তার সাথে যেতে। কিন্তু হালিম রাজি হয়নি। সে বললো, 'ভাই, আপনি যান। আপনার ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, তারপর বোন কুসমী আছে। কখন কি হয় বলাতো যায় না। আমি দেখি কবে ফিরি!'

তারপর থেকেই ছেলের জন্য রূপজান খাতুনের অপেক্ষার পালা শুরু। দিন যায়–মাস যায়, সংগ্রাম তখন স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপ নেয়। পাশের বাড়িতে একটি ব্র্যান্ডের রেডিও আছে। সে রোজ সে বাড়িতে গিয়ে খবর শোনে। তার উদ্বিগ্নতা বাড়ে। সে গ্রামের বয়স্ক লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেশের অবস্থা কি, চট্টগ্রামে কি যুদ্ধ চলছে।

সে জানতে পারে পাশের গ্রামের এক ছেলে পুলিশে চাকরি করে। সে ওই বাড়িতে খবর নিতে যায় যে তাদের সাথে তাদের ছেলের যোগাযোগ আছে কি না। হ্যাঁ, আছে জেনে সে ভেতরে ভেতরে শংকিত হয়, তাহলে কেন হালিমের কোনো সংবাদ নেই। এরপর থেকে সে যাকে-তাকে দেশের অবস্থা সম্পর্কে, যুদ্ধ সম্পর্কে, চট্টগ্রাম ও পুলিশবাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুরু করে।

এক একজন এক একভাবে উত্তর দেয়। কেউ বলে মাকে হালিমের খবর পাঠানো উঠিত, কেউ বলে চিঠিপত্র পথে মিসিং হয় বা প্রশাসন পড়ে দেখে পাকিস্তান বা হানাদারবাহিনীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর কিছু লেখা আছে কি না, থাকলে সে চিঠি ছিঁড়ে ফেলা হয়। কেউ কেউ বলে অনেকে অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। কেউ বা আবার বলে পালিয়ে ত্রিপুরা অর্থাৎ ভারতেও চলে যেতে পারে। সেখান থেকে ট্রেনিং, অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে দেশে এসে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

ছেলের কোনো সংবাদ নেই কেন, রূপজান খাতুন এর কোনো কারণ খুঁজে পায় না। সে একবার ভাবে ছেলে যুদ্ধে গেছে তাই যোগাযোগ করতে পারছে না। আবার ভাবে হয়তো চিঠি খুলে পড়ে ছিঁড়ে ফেলে। কারণ হালিম তো চিঠি না লেখার মতো ছেলে নয়, আর নয়তো যুদ্ধের কারণে চিঠিপত্র আসা বন্ধ আছে।

দেশে মুক্তিকামী জনতা পাকিস্তান হানাদারবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং তা ক্রমে জোরদার হতে থাকে। ভারতে লক্ষ ছাড়িয়ে কোটি মানুষ শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। এতদিন ভেতরে ভেতরে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা দিয়ে আসলেও তা ছিল অব্যক্ত ও অপ্রকাশ্য। কিন্তু ৩ ডিসেম্বর '৭১ পাকিস্তান বিমানবাহিনী কোলকাতার দমদম বিমান বন্দরে বিমান আক্রমণ চালালে ভারত সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পরে। শুরু হয় তৃতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ। মুক্তিসেনারা ভারতের সহযোগিতা ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে একযোগে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে।

অবশেষে আসে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকাল। রেসকোর্স ময়দান- লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, জেনারেল অফিসার কমেন্ডিং ইন চীফ, ইন্ডিয়া ও বাংলাদেশ যৌথবাহিনী পুর্বাঞ্চলীয় থিয়েটার এর কাছে তার প্রতিপক্ষ লে. জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী, সামরিক আইন প্রশাসক, জোন 'বি' এবং কমেন্ডার ইস্টার্ন কমান্ড (পাকিস্তান) এর আত্মসমর্পনের মধ্যে দিয়ে বাংলার মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

যুদ্ধ শেষ, দেশ স্বাধীন। মুক্তিসেনারা বাড়ি ফিরে যায়। পরে বঙ্গবন্ধুর কথায় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় সৈন্যদের স্বাধীন বংলার মাটি থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। তারাও যুদ্ধ শেষে বাড়ি ফিরে যায়।

কিন্তু হালিমের বাড়ি ফেরা হয় না আর হয় না হালিমের মতো কিছু সাহসী সৈনিকদের। ছেলে বাড়ি ফিরবে এ আশাতে মা পথের দিকে তাকিয়ে থাকে আর শান্তনা খোঁজে আজ না এলেও কাল আসবে। হালিমের কোনো খবর নেই কেন? সে কি আর বাড়ি ফিরতে পারবে না বা সে কি যুদ্ধে শহিদ হয়েছে। মায়ের মন এসব নিয়ে ভাবতে চায় না। আবেগ যেখানে প্রকট ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, যুক্তি সেখানে দুর্বল আর মানাও হয় না। সে শুধুই অপেক্ষায় থাকে হালিমের বাড়ি ফেরার পথের দিকে তাকিয়ে। এভাবে আজ নয় কাল করতে করতে মাসের পর মাস পার হয়।

বিশ্বাস একদিন দুর্বল হয়ে যেতে থাকে। আস্থা একদিন নড়বড়ে হয়ে যায়। ধৈর্য্য একদিন অধৈর্য্যের কাছে হারতে বসে। ছেলে বাড়ি ফিরবে সে আশায় একদিন চির ধরে।

হালিমের সেই ফুফুর বাড়িতে মাঝে মাঝে একজন সাধু প্রকৃতির লোক আসে। বাড়ির সবাই তাকে শাসাব (শাহ্ সাহেব) বলে ডাকে। তিনি এক সময় গাছের নীচে বসে ধ্যান করতো বলে জানা যায়। সে এলেও বাড়ির সবাই তাকে খুব খাতিরযত্ন করে। সে কখনো যাতায়াত খরচ ছাড়া আর কোনো টাকাপয়সা নেয় না। সে কামেল মানুষ কি না সেটা যার যার বিশ্বাসের ব্যাপার। কিন্তু নিঃসন্দেহে একজন দরবেশ বা ফকির প্রকৃতির মানুষ। একদিন সেই দরবেশ লোকটি প্রতিবেশীর বাড়িতে এলে হালিমের মা তাকে হালিম কোথায় আছে, কেমন আছে জিজ্ঞেস করে। মায়ের মন তো তাই সে তাকে জিজ্ঞেস করেনি হালিম জীবিত আছে না মারা গেছে। তখন সেই দরবেশ লোকটি নামাজে সেজদা দেওয়ার মতো করে মাটিতে মাথা নুইয়ে কিছু সময় ধ্যানমগ্ন থাকে। তারপর উঠে বসে। তার মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর বলে, 'আপনার ছেলেকে যে আমি দেখতে পেলাম না।' দরবেশ লোকটির চোখে মুখে কিছুটা বেদনার ছাপও দেখা গেল। একটু পরে আবার বলে, 'ঘুমিয়ে গেছে, মা, ছেলে যে ঘুমিয়ে গেছে।'

মা হয়ে ছেলের মৃত্যুর কথা সে শুনতে চায়নি আর মানতেও পারেনি। সে ঘর থেকে বের হয়ে যায় আর বিড়বিড় করে বলতে থাকে, 'ও লোক কি জানে! কিসের দরবেশ, কিসের কি!'

এরমধ্যে আরো কিছুদিন গত হয়। হালিম ফেরে না। হালিমের মা মনে মনে শংকিত হয়ে পড়ে এ ভেবে যে হালিম কী সত্যিই আর নেই। ওই বাড়িতে সে দরবেশ লোকটি আবার এলে হালিমের মা এবার নিজে কিছু না জিজ্ঞেস করে হালিমের সেই ফুফুকে দিয়ে হালিমের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায়। এবারো দরবেশ লোকটি পূর্বের ন্যায় ধ্যানমগ্ন হয়ে হালিমকে খোঁজে। কিন্তু না, এবারো সে ধ্যান থেকে উঠে বলে, 'না, আমি যে ছেলেটাকে কোথাও দেখতে পাই না। ও যে আকাশে-বাতাসে মিলিয়ে গেছে।'

এবার একই কথা শুনে রূপজান খাতুন আর রাগ হয়নি। সে চোখ মুছতে মুছতে চলে যায়। আর যেতে যেতে নিজে নিজে বলে মারা গেলে কোনো না কোনোভাবে কি সে খবর আসতো না। কেউ না কেউ তো এসে বলত হালিম নেই। আজো সে ভাবতে চায় না হালিম মারা গেছে।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। যারা যারা চাকরি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল বা পালিয়ে গিয়ে অশস্ত্র বা সশস্ত্র যুদ্ধ করেছিল তারা নতুন দেশে বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কাজে যোগদান করে।

পুলিশবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি ও জনবল নিরুপণ করতে একটা কমিটি গঠন করা হয়। সুবেদার মেজর ইব্রাহিম ওই কমিটির সামনে টেস্টিফাই করে যে ২৯ মার্চ রাতে সে পুলিশ লাইনে প্রচুর গোলাগুলির শব্দ পায়। সে রাতে সে বের হয়নি। সে পরেরদিন সকালে এলে দেখে হানাদারবাহিনী পুলিশ লাইন দখলে নিয়ে নিয়েছে। এক জায়গায় কিছু শহিদের লাশ পরে আছে। তার মাঝে হালিমের লাশও সে দেখতে পায়। তার বুকের দিকে জখম। সে পিছিয়ে যায়। তার চোখ দিয়ে পানি আসছিল। ওরা যদি তার চোখে পানি দেখে ফেলে তাহলে ওরা তাকেও গুলি করে মারবে। সে দূরে গিয়ে লাশদের প্রতি নজর রাখে। কিছু সময় পরে একটা কবর খুঁড়ে সবগুলো লাশ সেখানে গণকবর দেওয়া হয়।

রূপজান খাতুন উৎকণ্ঠিত ও কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে হাঁটছে। সে একটা বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। সে কি মনে করে যেন গাছের নীচে বসে। কিছুসময় পর সে বাড়ির ভেতরে যায়। এটা রেনুদের বাড়ি। রেনুর মা রান্নাঘরে কাজ করছিল। তাকে দেখে সে বের হয়ে আসে। সে তাকে রান্নাঘরে নিয়ে একটা টুলে বসতে দেয়। তারা কথা বলছে এমন সময় রেনু আসে। সে বাইরে থেকে বলে, 'মা, আমি একটু নাজমাদের বাড়ি যাই।'

তখন রেনু রূপজান খাতুনকে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'খালাম্মা, কেমন আছেন?'

'আছি মা! তুমি কেমন আছ?'

'ভালো।'

'ভালো থাকো মা, সেই দোআই করি।'

'খালাম্মা, আপনি বসেন আপনাকে পান এনে দেই।'

'দাও মা! তোমার হাতের পান খাইতেই আসলাম।'

রেনু ঘরে গেল।

'মেয়ে দেখি বড়ো হইয়া উঠল। তা বিয়ে–থা দেখতেছেন না, বুজি?'

'বিয়ের প্রস্তাব তো আসেই। ওর আব্বায় কয় আর কিছুদিন পরে। একটাই মেয়ে। ওর বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে বাড়িটা খালি হয়ে যাবে, তাই।'

'কেন্, মেয়েরে বাড়ির আশেপাশে বিয়া দিলে মেয়ে যখন ইচ্ছা তখন বাড়ি আসতে পারবে। তাইলে আর সমস্যা কি? তখন রেনু পান নিয়ে আসে।

'নেন খালাম্মা, পান নেন।'

রূপজান খাতুন পান হাতে নিয়ে বলে, 'মা, তোমার হাতের পান খুব মিষ্টি লাগে খাইতে। তুমি শ্বশুরবাড়ি চইলা গেলে এমন পান তখন আর কে খাওয়াইবো।'

রেনু মিষ্টি হেসে বলে, 'চিন্তা করবেন না খালাম্মা, আব্বা আমাকে এত তাড়াতড়ি শ্বশুরবাড়ি পাঠাবে না। আর যদি পাঠিয়েই দেয় তারপরও চিন্তা করবেন না, আমি আপনার জন্য ঠিকানা রেখে যাব।'

রেনুর এ উচ্ছল, সুমিষ্ট ও প্রাণবন্ত কথা শুনে রূপজান খাতুনের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে ওঠে। এ মেয়েটাকে যদি সে হালিমের সাথে বিয়ে করিয়ে বাড়ির বউ করে নিতে পার! কিন্তু কতদিন হয় ছেলেরই যেকোনো খবর নেই।

'খালাম্মা। হালিম ভাইকে অনেক দিন দেখি না। বাড়ি আসে না?'

রূপজান খাতুনের মনের কোণে জমে থাকা কষ্ট সহসাই কাঁচা হয়ে ওঠে। সে তার এতদিনের লুকানো আবেগ আর লুকিয়ে রাখতে পারে না। বড়ো অভিমানি হয়ে উঠে বলে, 'ওর কথা আর কইও না। সেই যে গেছে আর ফিরার কোনো নাম নাই। যদি আমার উপর রাগই হয় তাইলে একটা চিঠিপত্রও তো লিখতে পারে। মা রেনু, তোমারে যে ও খুব ভালো জানে। তাই অনেক সময় মনে মনে ভাবি আমারে চিঠি দিক আর না দিক কিন্তু তোমারেও যদি একটা ভালোবাসার চিঠি লিখত তাইলেও নয় বুঝতে পারতাম হালিম অন্তত বেঁচে আছে।'

বলতে বলতে রূপজান খাতুন হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে।

রেনু হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রেনুর মা তাকে শান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'যদি অভিমান করে যোগাযোগ বন্ধ করে থাকে তাইলে অভিমান ভাঙলে মায়ের ছেলে আবার মায়ের কাছে ফিরে আসবেই। আপনি কাঁদবেন না, বুজি।'

রূপজান খাতুন কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'আমি জানি, আমি সব জানি, হালিম যুদ্ধে মারা গেছে। সে আর কোনোদিন বাড়ি ফিরব না। আর চিঠি লিখব কেমনে, সে যে বেঁচেই নেই। যেখানে যাই সবাই আমারে এত ইজ্জত করে কেন্? আমি কি বুঝি না হালিম মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হইছে– আমি শহিদের মা, তাই। কিন্তু কেউ আমারে সত্যি কথাটা কইতে চায় না। শুধু ওই বুজির বাড়িতে যে 'শা সাব' আসে সেই আমারে সত্যি কইছে, হালিম ঘুমায় গেছে।'

এর কিছুদিন পরে একটি চিঠি আসে। পিয়ন সাইকেল থেকে নেমে বেল দেয়। রূপজান খাতুন বেল শুনে তড়িঘড়ি করে বাড়ির বাইরে আসে। পিয়ন তার হাতে চিঠি দিলে সে পিয়নকেই চিঠি পড়ে শুনাতে বলে।

পিয়ন পড়া শুরু করে, 'কাজী আবদুল হালিম, নায়েক নং- ২১৬০। বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আবদুল হালিম তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান পুলিশবাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি অত্যন্ত সফলতা ও নির্ভীকতার সাথে কাজ করেছেন। ২৯ মার্চ কর্মরত অবস্থায় তিনি পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে অসীম সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধ করেন। তার এ বীরত্বগাঁথা পুলিশবাহিনীর জন্য এক উজ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। দেশের জন্য...।

সে আর পড়ে না কারণ সে বুঝতে পেরেছে এ চিঠি এক করুণ কাহিনি জ্ঞাত করতে পাঠানো হয়েছে।

আবার শুরু করে- বাংলাদেশ পুলিশবাহিনীর পক্ষ থেকে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সালাম। তার বকেয়া বেতন, ভাতা ও অন্যান্য পাওয়ার জন্য তার পরিবারের পক্ষ থেকে স্থানীয় পুলিশ সুপার অফিসে যোগাযোগ করার জন্য বলা হলো।

রূপজান খাতুন জিজ্ঞেস করে পুলিশ অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হইছে কেন? পিয়ন গড়িমসি করে বলে মনে হয় কাজী আবদুল হালিম আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হইছেন। রূপজান খাতুন বলছে, 'তাইলে আমার হালিমের লাশ... '

বলতে বলতে সে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে ঢলে পড়ে।

এরপর বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযোদ্ধার মা হিসেবে হালিমের মাকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে আজো ভাবে ছেলে একদিন বাড়ি ফিরবে আর আজো সে পথপানে তাকিয়ে থাকে। আর যখন-তখন এমন কি গভীর রাতেও সে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ে আর বলতে বলতে যায়, 'হালিম বাড়ি আসতেছে। ওকে আগায় আনতে যা–ই–।'

শিয়রে বাংলাদেশ

নির্মলেন্দু গুণ

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল
তুই তখনও ছিলি আমার স্বপনে।
আমি পাঁজর খুলে বলেছিলাম তোকে,
আমার বুকে যা আছে তুই সব নে।

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল,
তুই তখনও ছিলি মায়ের ভ্রূণে।
আমি অস্ত্রজ্ঞানে আড়াল করে তোকে
তীর বানিয়ে রেখেছিলাম তূণে।

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল,
তুই তখনও ছিলি জন্ম-আশায়।
তোকেই তখন বড় করে দেখেছিলাম বলে
সঁপিনি মন নারীর ভালোবাসায়।

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল
তুই পরের ঘরে বন্দি ছিলি, মা গো।
আমি ঘর সাজানোর স্বপ্ন নিয়ে আসা
সুবর্ণাকেও বলেছিলাম, 'না গো।'

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল
অস্ত্র তুলে নিয়েছিলাম হাতে।
যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম দূর পাহাড়ি বনে
যদিও সায় ছিল না হত্যাতে।

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল
টগবগে লাল রক্ত ছিল বক্ষে।
তখন তোকে নরক থেকে মুক্ত করা ছাড়া
আর কী শ্রেয় ছিল আমার পক্ষে?

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল,
বিজয়-গর্ব ছিল না তোর স্বরে।

অমৃতের পুত্ররা মরে না

মোহাম্মদ সাদিক

অমৃতের পুত্ররা মরে না, মরে মরে বার বার জেগে ওঠে
বার বার সাহসের সংগোপন মন্ত্রে তারা পুনর্জন্ম পেয়ে যায়
রক্তপাত শুরু হলে পর প্রতিটি ফোঁটায় শুধু জন্ম
প্রতিটি ফোঁটায় শুধু আমৃত্যু স্লোগান, শুধু বুলেট ফেরানো বুক
অমৃতের পুত্ররা মরে না।

তারা মা'র বুক খালি করে অন্য কোনো মা'র বুকে চলে যায়
তারা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে, তারা জমি চাষ করে ফের রক্তাপ্লুত করে জমি
কখনো ফসল হয়ে যায় তারা, শস্য হয়ে যায় তারা
ফুল হয়ে যায় ফলবান বৃক্ষ হয়ে ওঠে আকালের দেশে

অমৃতের পুত্ররা মরে না, তারা শুধু প্রাণ দিতে ভালোবাসে
যখন গভীর রাত আসে, যখন বাতাসে শুধু বিষ
যখন হায়েনা নামে লোকালয়ে, যখন কেবলি
পাড়াগাঁর প্রান্তদেশে বলা আসে, রমণীরা ম্লান হয়ে যায়
যখন মায়ের শাড়ি প্রতিদিন কাফনের মতো ভিজে ওঠে
প্রতিদিন সাদা হয়ে যায়
উপোস উপোস শুধু ক্ষুধা হয়ে যায় প্রেম, বাণবিদ্ধ পড়ে থাকে
বালিকারন্ধ্রণ
নদীর কিনারে এসে আশা গাড়ে কাপালিক
যখন বাণিজ্যতরী ভালোবাসা ফেরি করে কংকালের লোভে

তখন বোনের দেওয়া রাখি, মা'র চুমু
কালো পাথরের মতো নতমুখী হয়ে যায়, তখন কেবলি কিছু
বলিষ্ঠ বাহুর ভালোবাসা টিকে যায়, তখন নদীর ম্লান
শেষ হয়ে আসে
পারাপার ক্লান্ত হলে পর মাটিতে মানুষ এসে
ভাঙচুর করে যায় দেশপ্রেম
ভাঙচুর করে যায় নগর ও নিসর্গের রাজপথ
অমৃতের পুত্ররা মরে না, তারা মেঠোপথে হেঁটে এসে অন্য কোনো
রাজপথ হয়ে যায়।

জীবন

জুননু রাইন

জীবন অনেক বড়ো হতে হয়
সুউচ্চ টাওয়ার, পাহাড়, গাছের মতো না
বড়ো হতে হয় ঘাসের মতো
দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হয় পদপিষ্টতা সহ্য করে।

জীবন অনেক বড়ো হতে হয়
থেতলে যেতে যেতে চ্যাপ্টা হতে হতে
বিস্তৃত হতে হয় ধৈর্যে সহ্যে...
মুক্তিআমী মানুষের মতো
জীবন অনেক বড়ো হতে হয়।

কবিতার কাটাকুটি তৈলচিত্র

সুধীর কৈবর্ত

কবিতায় শব্দ, পঙ্‌ক্তি, কিংবা পঙ্‌ক্তিমালাই
কাটাকুটি-আঁকিবুকির কোনো বিশেষ মুহূর্তে বিচিত্র
চিত্ররূপ পেয়ে যায় যদিওবা কখনো–
রবীন্দ্রনাথই স্বয়ং প্রজাপতি ডানা মেলে
আসবেন, বর্ণচ্ছটায় বর্ণিল করে
তুলবেন পুরো কবিতারই পরিপ্রেক্ষিত!
আর ঠিক তখনই কবিতাও হয়ে উঠবে
ধরিত্রীপ্রমাণ ভিন্ন আঙ্গিকের একক এক তৈলচিত্র!
এমনটাওকি হয়েছে, হয়, কিংবা
হয়ে উঠবেও কোনো দিন?

কালিদাসের মেঘদূত কি, প্রেমবার্তা কোনো
বয়ে নিয়ে আসবে অনন্তের প্রিয়া সমীপে?
জয়দেবের খাগড়া-লিখনি নিঃসৃত হয়ে
আসবে কি বর্ষা, নামবে কি রিমঝিম বরিষণ?
ভরা বসন্তের পূর্ণিমা রাতে সূক্ষ্ম বসনা
চিরযৌবনা লাস্যময়ী যত অপ্সরা সেজেগুজে
নেমে আসবে; ধরিত্রীরই পুষ্পিত-মৌমৌ
সুবাসিত অরণ্যমঞ্চে মদির কটাক্ষে দুলিয়ে
দেহ বল্লরী মেতে উঠবে নৃত্যে-ভরতনাট্যম,
কত্থক, ওরিশি, কিংবা মণিপুরি– হয়তবা সবকটি
নৃত্যকলারই মিশেলে ছন্দ-তাল-লয়ে,
বীণারও অন্তরস্পর্শী সুরমূর্ছনায়!

ধবল মেঘ বয়ে চলা নীলাকাশে নিশাকরের
জোৎস্না-ঝরণা, জ্বলজ্বল ধ্রুব আর স্বাতী;
প্রকৃতিজুড়ে বহমান সুশীতল সমীরণ, বিহঙ্গে
কলস্বর, স্রোতস্বিনী বুকে কুলুকুলু ধ্বনি,
এত স্থিত শান্তিরই বাতাবরণ! হৃদয়বৃত্তে
অঙ্কুরিত শুদ্ধ, স্বস্তি বিস্তারে-বিকাশে ফলগুধারায়–
সত্তা আর মন-মননে! একি সত্যি! নাকি স্বপ্ন
ক্ষণিকের! হয়তবা স্বপ্নই, যদিচ আস্থারই প্রতীক,
ভেঙে, ভেঙ্গে দিও না ঘুমের দেশের হে
রূপলাবণ্যময়ী সুলোচনা নিশিজাগা পরীরা!

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান

মোশাররফ হোসেন ভূঞা

জাগ্রত জনতার মুক্তমঞ্চে তোমার অবিনাশী অঙ্গুলির আহ্বানে
তিমির বিনাশী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আলো নির্বিঘ্নে ঝরে পড়ল
রবির তেজোদীপ্ত আলিঙ্গনে মুখরিত হলো মুক্তির মিছিল।

পিতৃস্নেহের ছায়াতলে মুক্তিকামী মানুষের ঢলে, মহোল্লাসে
তাবৎ বিশ্বের বিস্ময় তুমি এক উন্নত শিরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

শেকড়ের সন্ধানে বাঁধভাঙা উত্তাল তরঙ্গে সমুদ্রের গর্জনে
খড়-তাপ রোদ্দুরের তপ্তপ্রান্তর পেরিয়ে অবিরাম অগ্রযাত্রা।

মুক্তিযুদ্ধের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু তোমার সমাধিতে আজ
জিজ্ঞাসা হয়ে ঝড়ে পড়ে আমার বেদনাসিক্ত অশ্রুজলের ঢল
বুকের ভেতরে সঞ্চিত কষ্টগুলো হয়ে যায় একটি শোকের পাহাড়
রই নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে, দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে ওঠে রক্তাক্ত বাংলাদেশ।

রবে যতদিন তোমার পদচিহ্ন আঁকা গ্রামবাংলার মেঠোপথে
হয়ত হাজার বছর শেষে কোনো এক পূর্ণজনমে আবার
মানব সভ্যতার পতন রুখে দাঁড়াতে আসবে তুমি ফিরে
নতুন দিনের সোনালি সূর্য তোমাকে জানাবে অভিবাদন।

দেশরত্ন শেখ হাসিনা

সোহরাব পাশা

প্রতিদিন তোমার সুখ্যাতি বিশ্বময়
তুলছে অনন্য সাফল্যের দীপ্তঝড়,
কেনো না তুমি তো মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে
রাত্রির আঁধার ভেঙে ছিনিয়ে এনেছো
নতুন ভোরের আলো
এই মৃত্তিকা, মানুষ, গোলাপ বাগান
আর ভোরের পাখিরা সে কথা জানে,
শুধু বাংলাদেশ আর বাঙালির নয়
সারা পৃথিবীর জন্যে এনেছো সোনালি
দিন, স্বপ্নময় সুবাতাস;
পিতৃহারা, মাতৃহারা, কত প্রিয় স্বজন হারানো
বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত, অকৃপণ হৃদয়ে তুমি
ভালোবেসেছ বাংলার দুঃখি মানুষকে,
অশ্রু চোখে ভালোবেসেছ এই
বাংলাদেশকে,
তুমি নিজ হাতে মুছে দিয়েছ মুক্তিযুদ্ধে
সন্তান হারা দুঃখি মায়ের চোখের জল,
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বঙ্গ জননীর কন্যা
তুমি 'দেশরত্ন' শেখ হাসিনা, নক্ষত্রের মতো
তোমার নাম চির উজ্জ্বল অম্লান থাকবে এই বাংলায়
আর বাঙালির হৃদয় আকাশে;
শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, সবখানে
আজ আনন্দের যে ঝর্নাধারা, সে তো তোমার জন্যে;
দেশ ও জাতির কল্যাণে আন্তর্জাতিক বিশ্বে
তুমি উজ্জ্বল করেছ বাংলাদেশের সুনাম,
মহাকালেও মুছে যাবে না তোমার নাম।
কেনো না তুমি নতুন বাংলাদেশের রূপকার
বাঙালি শিখেছে আজ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার
সারাবিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার
বিশ্ব জেনে গেছে শ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাঙালি ও
বাংলাদেশের অহংকার।

বিজয় পতাকা

জাকির হোসেন চৌধুরী

ইতিহাসের সেরা বজ্রভাষণ ৭ই মার্চ '৭১
সমুদ্রে যেন উঠল জলোচ্ছ্বাস, নৌকার মাঝি
কৃষক-শ্রমিক-নারী-ছাত্রছাত্রী, হাজির হলো
বাঁশের লাঠি নৌকার বৈঠা নিয়ে।

নিকষ কালরাত হায়ানেরা যেন নিরুপায়
ঝাঁপিয়ে পড়ল নীরহ মানুষের উপর
গণহত্যার চরম নৃশংসতা দেখল বিশ্ববাসী
অগ্নিসংযোগ হত্যা-ধর্ষণ কিছুই বাদ রাখেনি ওরা।

বিশ্ব বিস্মিত হলো সকল শ্রেণির বাঙালি
অংশগ্রহণে শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ
নয় মাসে থামতে হলো ওদের রক্ত পিপাসা
ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্ত স্রোত, আড়াই
লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পেলাম বিজয়।

উদিত হলো নতুন সূর্য 'বাংলাদেশ' বিশ্ব মানচিত্রে।
বিজয় পতাকা তাঁদেরই যাদের সম্ভ্রম
আর রক্তে ভেজা স্বাধীনতা।

বিজয়ের আনন্দে

লিলি হক

লিখে যাও আরো আরো যদি পারো
দুর্বার স্রোতধারায় বহতা নদীর মতো
বইতে থাকুক শব্দের সাজানো পঙ্‌ক্তি শত
শুনছি ইদানীং তুমি নাকি হাজার নদীর দেশে
জাল ফেলেছ অক্ষর মাত্রাবৃত্ত
আর ছন্দ বৃত্তের আশায়।

ভালো কথা
লিখ না দেশমাতৃকার কথা
যেখানে রাখালিয়া সুরে আজো উদাস হয়
শ্যামলা মেয়ে পদ্মা-মেঘনার ঢেউয়ে
যেখানে মাঝি গেয়ে যায় ভাটিয়ালি
পাখি ডাকা ভোরে বধূটি ঘোমটা মাথায় কলসি ভরে
কাজল দিঘির ঘাটে,

মায়ের অজু করা মুখটা চিকচিক করে মুক্তা বিন্দুর মতো
ফুটাও কালির কাশফুলে হাসি গান কথা
প্রকাশ কর কবি আমার মনের যত কথা
লিখার প্রেরণা দিলে জীবনের চড়াই-উৎরাই পথে
কথা দিলাম বিজয়ের আনন্দে লিখে যাব
জীবনের ঘ্রাণে
আজ হতে
তোমরা বন্ধু যদি।

নদী

সাদিয়া সুলতানা

নদীকে ডাক দিল
নিকষ কালো গভীর কুয়ার জল
ডাক দিল এক দুপুরে বসন্তের কোকিল ও
কার ডাকে সাড়া দেবে নদী?

গুটিগুটি পায়ে হেঁটে এগোয়
কুয়াশা ঢাকা এক ভোরে।
নদী খোঁজে তাঁর শৈশব-কৈশর
আর সোনালি যৌবন।
একবার পথ হারালে কী
নদী আর সমুদ্রের দেখা পায়!

স্বপ্নের সমুদ্রে

বোরহান মাসুদ

ক্লান্ত বিকেলে হেঁটে হেঁটে একাকী দাঁড়াই
গুচ্ছ গুচ্ছ রোদের মাঝে
নদীর ভাঙনের মতো চোখের দুকূলে
বিকেল ভেঙে ভেঙে সন্ধ্যা গড়ায়।

পাখির ঐক্যসুর, এ সন্ধ্যার আনন্দ মুছে দেয়
সারাদিনের ক্লান্তি
উদার রাত খুলে দেয় তখন শীতের দরজা
নীরব মনে আমি, তার মনোযোগী পাঠক।

সেই প্রণয়ের উৎসবে, সেই নিপুণ শিল্পের উৎসবে
আমার চূড়ান্ত উচ্চারণ, আমি তোমাকে ভালোবাসি।
হে সোনালি রাত, যে শীতের উৎস
তুমি আমায় দিয়েছ, তার মুখোমুখি বসে
নতুন পিঠার গন্ধ শুকে শুকে ঐতিহ্য যে সুখ
সে সুখে মনের অজান্তে নেচে ওঠে প্রাণ।

বৃষ্টির মতো পাতা ঝরার মাঠে যখন দাঁড়াই
হলুদ আঁচলের মতো
পাতাগুলো উড়ে উড়ে আমাকে ছুঁয়ে যায়,
সেই তৃপ্তিতে রোজ ভালোবাসার স্বপ্ন চোখে
আমার আনন্দের উৎসব।

সকাল যায়, দুপুর যায় ফিরে আসে রাত
অবুঝ শিশুর মতো, মমতায় উঁকি দেয় শীত
তাকেই ভালোবেসে হারাই স্বপ্নের সমুদ্রে।

জাতির পিতার স্মরণে

তারাপদ দাস

বাংলা, বাঙালি আর বাংলাদেশ
নতুন আঙিকে সৃষ্টি যার
তিনি আর কেউ নন
মুজিবুর মুজিবুর মুজিবুর।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা যিনি
প্রতিভূ যিনি গণতন্ত্রের
তিনি আর কেউ নন
মুজিবুর মুজিবুর মুজিবুর।

শোষণ মুক্তির অর্থনীতি
সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা যিনি
তিনি আর কেউ নন
মুজিবুর মুজিবুর মুজিবুর।

হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান
ধর্ম নিরপেক্ষতায় মিলন যার
তিনি আর কেউ নন
মুজিবুর মুজিবুর মুজিবুর।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্রে
গঠন করলেন যিনি সংবিধান
তিনি আর কেউ নন
মুজিবুর মুজিবুর মুজিবুর।

আত্মত্যাগের মহিমা দিয়ে
জাতির পিতা যিনি হলেন
তিনি আর কেউ নন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

বিজয়ের পতাকা

শারমিন সাথী

চাঁদ তারা পতাকা
নুয়ে পড়েছে পশ্চিম আকাশে
যুদ্ধ জয় এখন নিশ্চিত।
জনবিরল পথঘাট..
বুদ্ধিজীবীদের হত্যায় মেতে উঠেছে,
বধ্যভূমিতে লাশের স্তূপ,
সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ,
বাংলাদেশ নামের একটি রাষ্ট্রের জন্ম হতে চলেছে।
সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাল-সবুজের পতাকা
মুখরিত স্লোগানে,
মানুষের ভিড় মেতে উঠেছে আনন্দ উল্লাসে
শোক এখন বিজয়ের আনন্দে
মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে
জাতির পতাকা
জয় বাংলা স্লোগানে...

ধারাবাহিক উপন্যাস

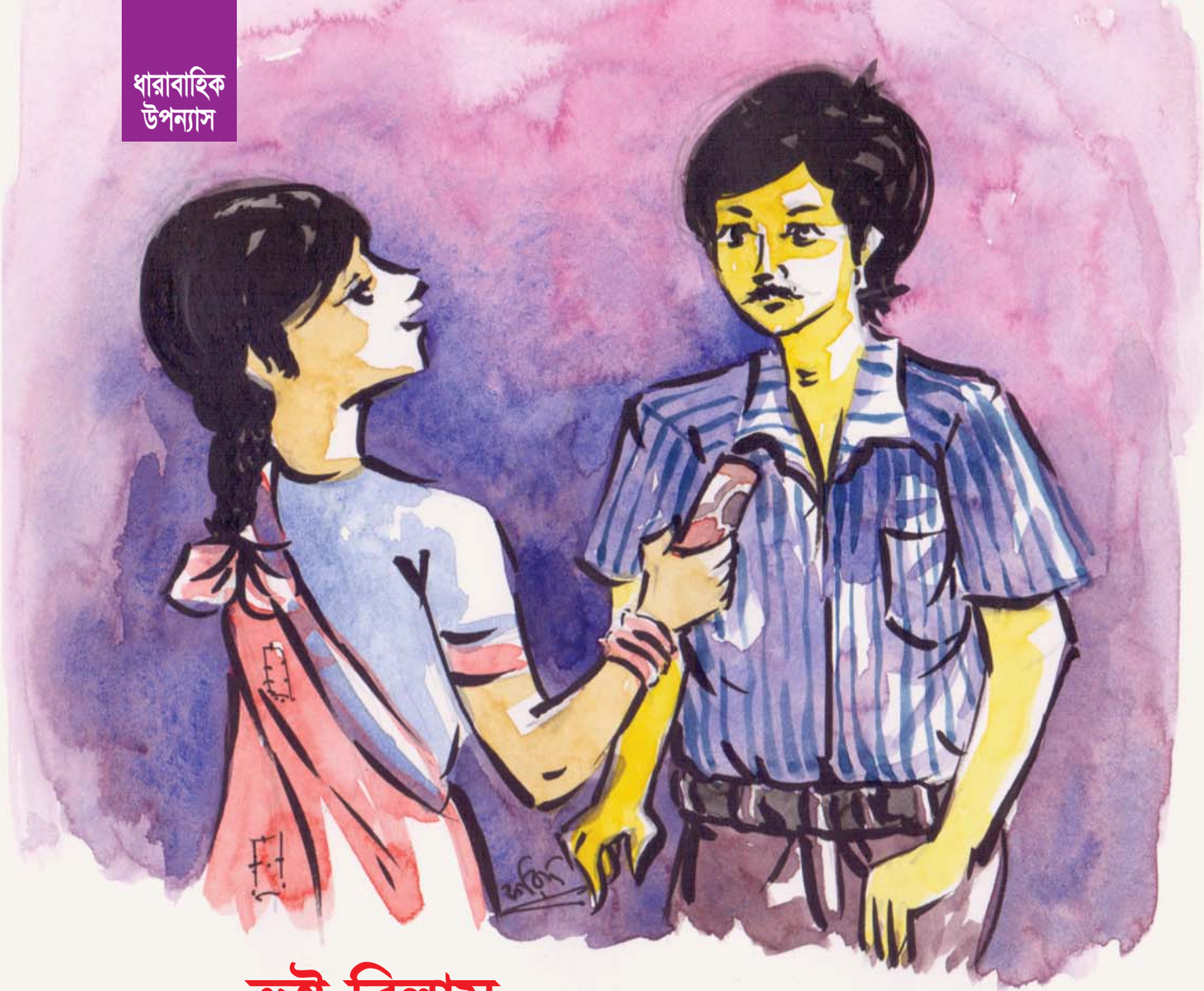

ভ্রষ্ট বিলাস

সাগরিকা নাসরিন

সুলেমানের ভাবগতি বোঝা মুশকিল। তার চলাচল অনেকটা সাপের মতো। ঠাণ্ডা, কখন ডেরায় ফেরে-বেরিয়ে যায় দুবোনের কেউ তা টের পায় না। তাকে সাবলেটে থাকতে দেওয়া হয়েছে। বিনয় মণ্ডল–সমীর দেওয়ানের সাথে। একটা রুমে দুটো চকি। কোনোরকমে মাথা গুঁজে তারা দিন গুজরান করে। থাকাটা একসাথে হলেও খাওয়াটা আলাদা।

পারুল, বকুলের ডাকে মাঝে মাঝে খেতে আসে সুলেমান। তখন খাবারের খরচটা বেঁচে যায়। চাকরিটা নেহাত মন্দ নয়। সোয়েটার কোম্পানি। বকুল তার উপকারই করেছে। সংসার চালানোর খরচ সে পাঠাতে পারে। একটু বাড়তি হিসাব করে চললে বাড়তি টাকাটাও সে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। সংসারী মানুষ সুলেমান। সংসারের প্রতি দায়িত্ব–কর্তব্যহীন মানুষ তার পছন্দ নয়।

কাজের মানুষ কখনো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। পারুল–বকুলের সংসারের খবর নিতেও ভোলে না সুলেমান। জয়নবকে এটা ওটা কিনে দেয়। সুলেমানকে দেখে জিয়ারতকে আরো অমানুষ মনে হয়। মানুষে মানুষে কত ব্যবধান! সংসারের প্রতি জিয়ারতের উদাসীনতা নতুন করে আবিষ্কৃত হয়ে চোখের সামনে গেঁথে থাকে পারুলের। অভিশাপ দিতে মন চায়। কিন্তু জয়নবের বাবা বলে অনেক কষ্টে নিজেকে বিরত করে সে।

এতদিন তার বদ্ধ ধারণা ছিল, সব পুরুষই বোধহয় এমন। সংসার বিমুখ। সুলেমানকে যত দেখে বিশ্বাসটার ভিত ততটা নড়ে ওঠে। ভালো মানুষের আকাল এখনো শুরু হয়নি পৃথিবীতে।

কিন্তু বাবার প্রতি জয়নবের ঘৃণার প্রশমন সে কিভাবে ঘটাবে। দিন দিন ঘৃণাটা বাড়ছে। ক্ষোভ বাড়ছে। মাঝে মাঝে প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষাটাও বেড়ে আসমান ছোঁয়া হয়ে যায়। মনাইয়ের অত্যাচার যত বাড়ে, সমান তালে তাল মিলিয়ে বাড়ে বাবার প্রতি জয়নবের ঘৃণা। তার বাবা একজন ভালো মানুষ হলো না কেন!

বকুল শান্ত্বনা দিয়ে বলে, মাফ কইরা দে।

কেমনে মাফ করুম। আমার অসুস্থ মায়রে হাসপাতালে ফালাইয়া অন্য বদ মেয়েমানুষ নিয়া যে বাপ ভাইগা যাইতে পারে...।

তবুও।

তোমার বাপ হইলে তুমি বুঝতা খালা। আইজ আমার বাপ নাই বইলা মনাইর সাহস বাড়ছে। আমার বাপ যদি ল্যাংড়া-লুলাও হইত, মনাইর অত্যাচারের প্রতিবাদ করত। লাঠি নিয়া দাঁড়াইত।

বকুল উত্তর দিতে পারে না। আলো বিবিকে নিয়ে জিয়ারত নতুন সংসার গড়েছে। খবরটা কানে আসার পর থেকে জয়নবের কষ্টটা শতগুণে বেড়েছে। পারুলের কষ্টকেও ছাড়িয়ে গেছে। জিয়ারতের কঠিন করুণ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করে পারুল। কিন্তু জয়নব চায় প্রতিশোধ।

মায়ের কাছে সে শুনেছে, তার জন্মের সময়ও তার বাবা অন্য নারী নিয়ে ব্যস্ত ছিল। নারীর প্রতি মোহ তাকে সকল দায়িত্ব থেকে চিরকাল দূরে সরিয়ে রেখেছে। অসুস্থ জয়নবকে কোনোদিন সে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়নি।

বকুল আবারো শান্ত্বনা দিয়ে বলল, তুই তারে মাফ কইরা দিস। এইটাই তার বড়ো শাস্তি। সন্তানের করুণা নিয়া সে বাঁইচা থাকব। অভিশাপ না দিয়া করুণা করিস।
অভিশাপ দিতে চাই না খালা। এমনিই আইসা পরে।
তোর অভিশাপ দেওয়া লাগবে না। তুই কি মনে করস। আলো বিবিরে নিয়া সে সুখে আছে। চৌদ্দ ঘাটের পানি খাওয়া মাইয়ামানুষ লইয়া কেউ সুখে থাকতে পারে? এর চাইতে বড়ো শাস্তি আর কি চাস?
আমি ওর মরণ চাই খালা। গরম তেলে কৈ মাছ যেমন কইরা পুড়তে পুড়তে মোচড়াইয়া ওঠে আমি চাই ঐ রকম যন্ত্রণায় ও ছটফট করুক। মরণের যন্ত্রণা ভোগ করুক।
তোর চাওয়া ছাড়াই বদ মেয়েলোকের পাল্লায় পইড়া ও জ্বলতাছে–পুড়তাছে। পাপ কি বাপেরে ছাড়ে জয়নব?
বকুলের কথায় চিন্তায় পড়ে যায় জয়নব। এই পাপী লোকটা সত্যি কেমন আছে, জানতে ইচ্ছে করে। কষ্টই একমাত্র শক্তি যা মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে। জ্বালা থেকে জিদ আসে। ব্যবসায় হাত দেয় জয়নব। মাকে নিয়ে বাঁচতে হবে। দাঁড়াতে হবে। ভ্যানটাকে নতুন করে সাজিয়ে তুলে মাথা খাটালে কম খরচেও ভালো কিছু হয়। চকলেটের ফয়েল আর কম দামি রঙিন কাগজ দিয়ে সে দোকান সাজায়। পান–সুপারি, আচারের কোয়ালিটি আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে। দেশি ফলের সংযোজন বেড়েছে। সুলেমান পাইকারী বাজার থেকে কদবেল, ডাব, আমলকি, জলপাই, চালতা, তেঁতুল কিনে আনে। কম দামি দেশি ফলের চাহিদা বেড়েই চলেছে। মেয়ের ব্যবসায়িক বুদ্ধি উদ্দীপ্ত করে পারুলকে। রান্নাবান্নার কাজকে তার কাজই মনে হয় না আজকাল। তিনজনের রান্না সে একবারে সেরে ফেলে। জয়নবও হাত লাগায়। মায়ের প্রতি দরদের যেন শেষ নেই মেয়েটার। চুলে তেল দিয়ে বেনি করে দেয়। রাতে পায়ে ভেসলিন ঘষে দেয়।
মাঝে মাঝে মা–খালার সাথে লুডু খেলে জয়নব। তার সব খবর কিভাবে যেন পৌঁছে যায় মনাইয়ের কাছে। রাস্তায় পথ আটকে দাঁড়িয়ে হুমকি দিয়েছে সে।
আমার সাথে ডেটিং–এ যাইতে রাজি না হইলে সাপলুডুর বড়ো সাপটার মতো এক লাফে কোত কইরা খাইয়া ফ্যালাবো।
জয়নব ভয় পায়। মনাইকে বুঝতে দেয় না। কোত্থেকে যেন সাহস পায় বুকে। মৃদু হেসে বলে, আপনে নিজেরে সাপের মতন ভয়ংকর মনে করেন কেন? আপনেতো কুকুরের মতো উপকারী। ভালো মানুষ।
রেগে যায় মনাই। জয়নব আবারো নিজের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস জাগিয়ে তুলে বলে, রাগ করণের কী হইল। কুকুরের গুণগুলা একটু জাইনা দেইখেন।
অনেক কষ্টে মনাইকে মানিয়ে চলে জয়নব। তবুও শেষ রক্ষা হতে চায় না। বকুলকে সে হুমকি দিয়ে বসে সময়ে–অসময়ে। তবে সহজে হাতে পাওয়া ভ্যানে ব্যবসায়ী পারুলকে কী কারণে যেন এড়িয়ে চলে মনাই। হয়তো এখনো সাহস করে উঠতে পারছে না। কিন্তু সাহসতো কোনো জড়ো পদার্থ নয়, যে তার হাত-পা, শাখাপ্রশাখা গজাবে না।
কচু গাছ কাটতে কাটতে মানুষ ডাকাত হয়। মনাই যেদিন ডাকাত হবে, সেদিন হয়তো ভয়ংকর কিছু ঘটে যাবে। জয়নবের ছোটো বুকে অজানা আতংক এসে ভর করে। ইতিমধ্যে বোরকা কিনে ফেলেছে সে। নেকাব-হেজাব কোনোটাই বাদ দেয়নি। তবুও ঠিকই সাপটা গন্ধ শুকে শুকে হাসনা-হেনার বাগানে ঢুকে পড়ে। মনাইকে তখন সাপের চেয়েও বিষধর মনে হয়। যখন সে নানান রং এর টি শার্ট আর রঙিন সানগ্লাস পরে গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে তখন সত্যিই লাউডগা সাপের মতো লাগে। সাপটা যখন জোর করে ফুল, চিঠি ধরিয়ে দেয় হাতে। তখন বুক শিরশির করে জয়নবের। কাহাতক ভালো লাগে বখাটেপনা!
রাতে ঘুম আসতে চায় না। এপাশ-ওপাশ করে জয়নব। মনাইয়ের চেয়েও বেশি ঘৃণা জন্ম নেয় জিয়ারতের জন্য। বাপের সাথে মিল করে তার নামটা কে রেখেছিল কে জানে। নামটা যদি পাল্টে দেওয়া যেত। একদিন হয়তো সে ইচ্ছেটার বাস্তবরূপ ঘটাবে। সেদিন খুব দূরে নয়।
রাত যত গভীর হয়। পারুলের নাক ডাকার আওয়াজ তত তীব্র হয়। ঘুম জয়নবের চোখ থেকে যোজন যোজন দূরে দৌড়ে পালিয়ে যায়। শেষ রাতে যখন ঘুমটা কেবল চোখের চারিদিকে আবছা অন্ধকার হয়ে আসতে শুরু করেছে। তখন দরজায় টোকা পরে। ধড়ফড় করে উঠে বসে জয়নব। মনাই এল না তো!
দরজার সামনে সুলেমানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্বস্ত হলো জয়নব।
মামা কী হইছে?
বাড়ি থিকা খবর আসছে। তোমার মামি খুব অসুস্থ।
আপনি যাবেন কিভাবে। এখন কোনো গাড়ি পাবেন?
পাব কি না জানি না। যাইতেতো হবে।
টাকাপয়সা আছে কাছে?
সেই জন্যেইতো চিন্তা করতেছি।
দু'জনের কথা শুনে পারুল, বকুল উঠে এসে দাঁড়িয়েছে জয়নবের পাশে। পারুল দৌড়ে গিয়ে টাকা এনে সুলেমানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, টাকা লাগলে জানাইয়েন। লজ্জা করবেন না।
সুলেমান চলে যাবার পর বিছানায় ফেরে জয়নব। তার এখন ঘুম পাচ্ছে। বিনিদ্র রজনীর দেনাপাওনা শোধ করতেই মুদে আসা চোখের পাতা কখন যে নিস্তেজ হয়ে এসেছে, টের পায় না সে।
ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখে জয়নব। তার বাবা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দৌড়াচ্ছে। পিছনে বনের জন্তুরা ধাওয়া করেছে তাকে। জয়নব বাবাকে জিজ্ঞেস করল, দৌড়াইতেছ ক্যান বাবা?
হিংস্র জন্তুরা আমারে খাইয়া ফালাইব।
এত ভয় নিয়া বনে আসছ ক্যান?
আমারে বাঁচা মা।
আসো। আমার সাথে আসো।
বাবাকে নিয়ে একটা ছোটো কুঁড়ে ঘরে ঢুকে পরে জয়নব। মুহূর্তেই কুঁড়ে ঘরটা বড়ো প্রাসাদ হয়ে যায়। জয়নব বাবাকে বলে এইবার আর তোমার কোনো ভয় নাই।
হঠাৎ প্রাসাদের মাঝখানে একটা সুরঙ্গ তৈরি হয়। সুরঙ্গের ভিতরে তলিয়ে যেতে থাকে জিয়ারত।
বাবা... বাবা...।
আকাশ ফাটানো চিৎকার। অথচ কোনো শব্দ বের হয় না মুখ থেকে। সর্বশক্তি দিয়ে বাবাকে ডাকে জয়নব। ভয় আর আতংক নিয়ে ঘুমে ভেঙে যায় জয়নবের।
কী হইছে? স্বপ্ন দেখছোস।
পারুলের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না জয়নব। সারা শরীর কাঁপছে তার। সুরঙ্গে বাবার তলিয়ে যাওয়ার দৃশ্য এখনো চোখ থেকে সরে যায়নি।
স্বপ্নে কি বাপেরে দেখছস?
কেমনে বুঝলা মা?
মায়েরা সব ট্যার পায়। মা হওয়া এত সোজা না রে জয়নব।
তুমি সব বুঝতে পারো মা?
যেদিন তুই মা হবি সেদিন তুইও সব বুঝতে পারবি। তুই যে বাপের জন্য কত কষ্ট পাস, আমি সব ট্যার পাই।
আমার বাপে ক্যান ট্যার পায় না?
বাপ হওয়া যে অনেক সোজা মা। বাপেরা হইল সিংহের জাত। নিজের বাচ্চাও খাইয়া ফালায়। ওগো মায়া-মমতা একটু কম দিয়া দুন্নিয়্যাতে পাঠাইছে আল্লাহ।
সুলেমান মামা যে অনেক ভালো।
সে তো ভালো মানুষ। এগো সংখ্যা দুন্নিয়্যাতে অনেক কম।
আমার বাপটা ক্যান সুলেমান মামার মতো ভালো হইল না মা?
সব মানুষ কি সমান হয় মা? তবে একটা কথা মনে কইরা তুই শান্তি পাবি। সকল খারাপ মানুষের কিন্তু শাস্তি হয়। পাপ বাপেরে ছাড়ে না। তোর বাপ একদিন সে শাস্তি ঠিকই পাইব।
তোমার কি মনে হয়, এখন সে খুব শান্তিতে আছে? আলো বিবির মা তো মাইয়ামানুষ তারে খুব শান্তিতে রাখছে?
মেয়ের কথার আর কোনো জবাব দিতে পারে না পারুল। দুচোখ দিয়ে কেবল পানি নেমে আসে ঝরণাধারার মতো। চলবে.....

লিট ফেস্ট ঢাকা ২০১৬

সাইয়েদা ফাতিমা

বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেও সেতুবন্ধন তৈরি করে ১৭ নভেম্বর ঢাকায় শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসব। 'ঢাকা লিট ফেস্ট' অনেক আনন্দ আর উল্লাসের ছোঁয়ায় বিস্তৃত ছিল বাংলা একাডেমির সবুজ প্রাঙ্গণ। পুকুরপাড়, সবুজ প্রাঙ্গণ, ঐতিহাসিক বধ্যমান হাউসসহ বাংলা একাডেমিতে তিনদিনের আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসবকে ঘিরে ছিল সাজ-সাজ রব। দেশি-বিদেশি লেখকদের পদচারণায় বাংলা একাডেমি মিলন মেলায় পরিণত হয়। লেখকদের কোনো বিশেষ জাতি নেই, ধর্ম নেই। সারা দুনিয়ায় লেখকরা কোনো সীমানার বলয়ে আবদ্ধ নয়।

উদ্‌বোধনীর দিন সকালেই বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যদিয়ে সাহিত্যের তিনদিনের ফেস্টিবেল উদ্‌বোধন করেন নোবেল জয়ী ত্রিনিদানের সাহিত্যিক ভিএস নাইপল। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। সম্মানিত অতিথি ছিলেন– সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। বিশেষ অতিথি ছিলেন– একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান।

সাহিত্য উৎসব মূলত আমাদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। পাশাপাশি বিশ্ব সংস্কৃতি, বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের গড়ে উঠে নিবিড় সখ্য। প্রথম দিনের অধিবেশনে যোগ দেন নানা দেশের সাহিত্যিক, সমালোচক ও প্রকাশক। এবার বাংলা একাডেমিতে ষষ্ঠবারের মতো ঢাকা লিট ফেস্ট অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকরা বলেছেন, 'উৎসবের মূল লক্ষ্য সারা বাংলাকে বিশ্বে এবং বিশ্বকে বাংলার কাছে তুলে ধরা'। মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখা যায় বাংলা একাডেমির সবুজ প্রান্তর, পুকুর পাড়, ঐতিহাসিক বর্ধমান হাউসের চারদিকে ছোটো-বড়ো নানা স্টল। অধিকাংশ স্টলে থরেথরে সাজানো বই আর বই। শুধু লেখক, সাহিত্যিক ও প্রকাশকই নন, শিল্প-সংস্কৃতির নানা শাখার সরব উপস্থিতি আনন্দময় করে তুলেছিল ফেস্টিবেল প্রাঙ্গণ।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ১৭ নভেম্বর ২০১৬ বাংলা একাডেমিতে 'ঢাকা লিট ফেস্ট-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এসময় উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

মেলা শুরু হয়েছিল সাড়ে ১১টায়। তাতে স্বাগত বক্তব্য দেন তিন উৎসব পরিচালক– সাদাব সায় সিদ্দিকী, কাজী আনিস আহমেদ ও আহসান আকবর। পরে হুইলচেয়ারে করে মঞ্চে উঠে আসেন ৮৪ বছর বয়সের পৃথিবীখ্যাত নাইপল। এসময় অতিথিদের নিয়ে ফিতা কেটে তিনদিনের উৎসবের উদ্‌বোধন করেন ভিএস নাইপল। নাইপল জানালেন– 'ঢাকায় এসে আমি আনন্দিত'। কিছুটা রসিকতা করে বলেন, 'একবার এক অনুষ্ঠানে তাড়াতাড়ি করে ফিতা কাটছিলাম। তখন পাশে থাকা আমার এক বন্ধু বলল, ধীরে-ধীরে কাটতে হয়। আবেদনটা ধরে রাখতে হয়। আমি বোধ হয় এবারো তাড়াতাড়ি ফিতা কেটে ফেলেছি। ফিতাতো কাটলাম, এখন আমার হয়ে কেউ বক্তৃতাটা দিক। তাঁর রসিকতাপূর্ণ কথায় হেসে ওঠেন মিলনায়তন ভর্তি দর্শক শ্রোতা। উপভোগ করেন নাইপলের উপস্থিতি। মেলাকে ঘিরে অনেক প্রকাশক-সাহিত্যিকদের বলতে শোনা গেছে, বিভিন্ন মেলার মধ্যদিয়ে সমৃদ্ধ হবে আমাদের অনুবাদ সাহিত্য। যার মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারব আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সাহিত্যিকে। 'লিট ফেস্ট ঢাকায় ছিল বেশ স্বস্তির। উৎসবটি তরুণ সাহিত্যিকদের জন্য এক শুভময় বাতায়ন খুলে দিয়েছে। তরুণ লেখকরা নিজেদের অভিমত, অভিজ্ঞতা অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারছেন।

৯০টি অধিবেশনে সাজানো সাহিত্য সম্মেলনের প্রথমদিনে অনুষ্ঠিত হয় ১৫টি অধিবেশন। উদ্‌বোধনী আয়োজন ছিল জমকালো। সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ছিল দৃষ্টিনন্দন। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার পরিচালনায় সুরের ধারায় শিল্পীরা সংগীত পরিবেশ করেন। সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক স্মরণে নাটক প্রদর্শিত হয় প্রথম অধিবেশনে। তাঁর নীল দংশন নাটকটি ব্লু ডেনম শিরোনামে ইংরেজি অনুবাদে মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। নাটক নির্দেশনায় ছিলেন নায়লা আজাদ নূপুর। অভিনয় করেন আরিফ সৈয়দ ও তারিক আনাম খান। প্রদর্শিত হয়েছে ডিএস নাইপলকে নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্র।

এছাড়াও প্রদর্শিত হয়েছে জয়া আহসান অভিনীত চলচ্চিত্র ভালবাসার শহর। গান ও চলচ্চিত্রের পাশাপাশি প্রথমদিনের অধিবেশনে ছিল কবিতা আবৃত্তি।

সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান দর্শক শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করে। 'সাম্প্রদায়িকতার এপার ওপার' শীর্ষক আলোচনায় বক্তারা অসাম্প্রদায়িকতার ওপর জোর দেন। বক্তারা বলেন, জীবনযাপনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা সাম্প্রদায়িকতার মুখোমুখি হচ্ছি। কবিতা, নাটক এবং সাহিত্যের অন্যান্য শাখা দিয়ে তা রুখতে হবে।

প্রথমদিনের অন্যান্য অধিবেশনে উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান শেষে বেলা ১২টায় মেহেদি হাসান ও তার বন্ধুরা উন্মুক্ত মনে সংগীত পরিবেশন করেন। ব্রাক স্টেজে অনুষ্ঠিত হয় 'ক্রাইম পেইজ'। ১টায় মূল মঞ্চে বিশ্ব সাহিত্য নিয়ে 'ওয়ার্ল্ড ফিকশন হিডেন

রিয়েলিটি' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন ডেনিয়েল হান, নিকোলাস লেজার্ড, আনজুম হাসান ও নায়েল এলতোথি। কেকে টি স্টেজে ইমাজিনিং হিস্টোরি শীর্ষক আলোচনায় সাদ জেড হোসাইনের সঞ্চালনায় অংশ নেন সাজিয়া ওমর ও বাপ্পাদিত চক্রবর্তী। এ সময় ব্যান্ড তারকা মাকসুদ হক স্টিভেন পাওনার উন্মুক্ত মঞ্চে কবিতা পাঠ করেন। বেলা ২ টায় প্রধান মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ আলোচনা। অংশ নিয়েছিলেন ভারতের এনটিভি'র প্রধান সম্পাদক সাংবাদিক বারখা দত্ত, মার্কিন কবি জেফরি ইয়াং বেন জোহাদ ও মার্সিয়া লিন্যাক্স কিউলি। ৩ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ফারুক আলম আলোচনায় অংশ নেন কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সঙ্গে। আলোচনার বিষয় ছিল মীর মোশাররফ হোসেন রচিত বিষাদ সিন্ধু। উন্মুক্ত মঞ্চে বাংলাদেশের প্রথিতযশা কবিরা কবিতা পাঠে অংশ নেন। ব্রাক স্টেজে আলোচনায় অংশ নেন ভারতের প্রাবন্ধিক অন্তর গাঙ্গুলির সঙ্গে অভিনয় শিল্পী ইরেশ যাকের। আলোচনার বিষয় ছিল অন্তরা গাঙ্গুলির তনয়-তানিয়া নিয়ে। বটতলায় বসেছিল কবিতার আসর। ভিএস নাইপলকে নিয়ে নির্মিত বিশেষ ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয় 'দ্যা স্ট্রেস লাক অব নাইপন'।

বিকেলে মূল মঞ্চে বারখা দত্তের সঙ্গে আলোচনায় বসেন উৎসব পরিচালক সাদাফ সায়। আলোচনার বিষয় ছিল বারখা দত্ত রচিত বিতর্কিত গ্রন্থ দ্যা আনকোয়াইট ল্যান্ড। বিকেলে আর একটি আলোচনা দর্শকশ্রোতার মন কাড়ে। ভ্রমণ পিপাসু অস্ট্রেলিয়ান লেখক টিম কোপ কেকের জার্নি অ্যান্ড কোয়েস্ট অব ইন ট্রুথ বইটি নিয়ে। ব্রাক স্টেজে আলোচনায় অংশ নেন জেফরি ইয়াং, পুলিৎজার বিজয়ী ভারতীয় বংশোদ্ভূত কবি বিজয় শেষাদ্রি। সন্ধ্যা সোয়া ৬ টায় সব্যসাচী সাহিত্যিক সৈয়দ হকের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় সৈয়দ হক, সঙ্গে ছিলেন সাজ্জাদ শরীফ, আহমেদ মাজহার ও পারভেজ হোসেন। সবশেষে বাউলিয়ানা ঘরানার সংগীত পরিবেশন করেন সংগীত তারকা মাকসুদ হোসেন। উদ্‌বোধনীর দিন অধিবেশন শুরু হয় সকাল ১১টায়। শেষ হয় রাত ৮টায়।

লিট ফেস্টের মধ্যদিনে

সারা দিন ভিএস নাইপলের সেশনের জন্য ছিল অসংখ্য দর্শক শ্রোতার প্রতীক্ষা। সন্ধ্যার আগেই বাড়তে থাকে উৎসুক মানুষের ভিড়। সন্ধ্যার আগেই বাংলা একাডেমির প্রধান মিলনায়তন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। হুইলচেয়ারে করে ৮০ বছর বয়সি ভিএস নাইপল স্ত্রীকে নিয়ে মঞ্চে আসেন। ১ ঘন্টার বক্তৃতায় তিনি তাঁর লেখক জীবনের বর্ণনা দেন। নিজের সৃষ্টিকর্ম ও লেখক জীবন সম্পর্কে ভিএস নাইপল বলেন– সৃষ্টিশীল যে–কোনো কাজের পেছনে কাজ করে অদ্ভুত পাগলামি। পাশাপাশি না থাকলে সৃষ্টিশীল কাজ হয় না। উৎসবের মধ্যদিয়ে উৎসব পরিচালক আহসান আকবরের সঞ্চালনার আলোচনায় অংশ নেন নোবেল বিজয়ী বিশ্ববিখ্যাত লেখক ভিএস নাইপল। এই অধিবেশনের শিরোনাম ছিল 'দ্যা রাইটার আন্ড দ্যা ওয়ার্ল্ড'।

লিট ফেস্টের মধ্যদিনে অন্যান্য অধিবেশন

লিট ফ্যাস্টের মধ্যদিয়ে ছিল ছুটির দিন। সাহিত্য-প্রেমীদের ভিড়ে আনন্দমুখর ছিল বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণ। ফেস্টের জন্য ছিল নানা ধরনের আয়োজন। সাহিত্যের পাশাপাশি প্রকাশনা শিল্পের সংকট, নারী ও নারীর জীবনচিত্র মঞ্চনাটকসহ আরো নানা বিষয় নিয়ে সাজানো ছিল দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় দিনের আয়োজনে ছিল ৩৭টি অধিবেশন। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এই উৎসবের আয়োজন করেছে মানিক। উৎসবে ১৮টি দেশের ৬৬ জন বিদেশি ও দেড় শতাধিক বাংলাদেশি সাহিত্যিক, লেখক ও গবেষক অংশ নেন।

দুপুর ২টায় মূলমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় 'সাহিত্য যখন সবার' শীর্ষক অধিবেশন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আন্দালিব রাশদী। এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন– ইমদাদুল হক মিলন, মঈনুল আহসান সাবের, বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইমতিয়াজ শামীম। অভিনেত্রী বন্যা মির্জার সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন মঞ্চ নাটকের তিন গুণী শিল্পী– সারা সাকের, মিতা হক ও সামিনা লুৎফা। কেকে টি স্টেজে ড্যানিয়েল হার্নের সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন– ২০১৬ সালের ম্যান বুকার পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিক ডোরোবাহ স্মিথ, অরুণাভ সিনহা, চার্লস টার্নার ও কায়সার হক। ব্রাক মঞ্চে ইকোনমিস্ট পত্রিকার দক্ষিণ এশিয়ার ব্যারো চিফ ম্রাক্স রডেনবেকের সঞ্চলনায় আলোচনায় অংশ নেন– নরেশ ফার্নান্দেজ, মাঞ্জুলা নারায়ন ও শ্রীরাম কবরি। একই সময় কসমিক টেন্টে প্রদর্শিত হয় তথ্যচিত্র 'বলকেড'।

বটতলায় বসেছিল গল্প বলার আসর। নাজিয়া জাবিনের 'হাসের পায়ে ঘুড়ি' গল্পটি অনেকে মুগ্ধ হয়ে শোনে।

এগারোটায় জাষ্টিন রোলারের সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন, ম্যাক্স রোডেন বেন জুদাহ–বোজামান আবউইন ও ঢাকা টিবিডনের সম্পাদক জাফর সোবাহান। ১১টায় কেকেটি স্টেজে 'নারী ও নারীত্ব' বিষয়ক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

দুপুর তিনটায় কেকেটি স্টেজে অনুষ্ঠিত হয় 'টিকে থাকায় আজ-কাল-পরশু' পশ্চিমবঙ্গের নিউরো সায়েন্টিক গার্গো চট্টপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় অংশ নেন– ফিরোজ আহমেদ, চলচ্চিত্রকার ইন্দ্রনীল রায় চৌধুরী, সাহিত্যিক আহমেদ মোস্তাফা কামাল ও মানস চৌধুরী। এ সময় 'জীবনের কবিতা' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন নন্দিত কবি নির্মলেন্দু গুণ।

তিনদিনের লিট ফেস্টকে ঘিরে ছিল বাংলাদেশের শিকড় সন্ধানী নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। দিনটি শুরু হয়েছিল মারফতি গান দিয়ে। সাধনার নৃত্যশিল্পীরা মঞ্চস্থ করেন নৃত্যনাট্য 'পদ্মাবতীর আখ্যান'।

১০টায় ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করেন শেহজার দোজা, সৈয়দা ফাতেমা হাসান, জেফরি ইয়াং ও আহমাতজান ওসমান।

উৎসবের শেষ দিন

ঐ দিনের মূল আকর্ষণ ছিল বিকেল ৫টায় মূল মঞ্চে প্রদান করা জেসেকন সাহিত্য পুরস্কার। দীপ্তিময় আলো ছড়িয়ে ১৯ নভেম্বর শেষ হলো ঢাকা লিট ফেস্ট। শেষ দিনে সকাল থেকে রাত অবধি বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ছিল উৎসবমুখর। শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক নানা শাখা নিয়ে চলে মনোজ্ঞ আলোচনা। সেই সঙ্গে চলে দেশ-বিদেশের লেখকদের আড্ডা। ছিল কবিতা আবৃত্তি, নাটক, প্রদর্শনী, পুরস্কার প্রদানসহ নানা আয়োজন। বাংলা সাহিত্য সমাদৃত হয়ে ছড়িয়ে যাবে সারাবিশে– এই আশাবাদে ভাঙল সাহিত্যের এই মিলনমেলা।

সমাপনী দিনে ছিল ৩৯টি অধিবেশন। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার এই দিনের উৎসবের আয়োজন করেছে যাত্রিক। উৎসবে অংশ নিয়েছে ১৮টি দেশের ৬৬ জন সাহিত্যিক, শিল্প সংশ্লিষ্ট বিদেশি অতিথি। দেড় শতাধিক বাংলাদেশি সাহিত্যিক, লেখক ও গবেষক এ মেলায় অংশ নেয়।

সমাপনী দিনে দুপুর ১২টায় উৎসবের মূলমঞ্চে আবদুল কবির

সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় যুদ্ধ শেষের যুদ্ধ শীর্ষক অধিবেশন। এতে আলোচনায় অংশ নেন– কথাসাহিত্যিক আকিমুন রহমান, কবি মাহবুব আজীজ, সাংবাদিক ফারুক ওয়াসিফ ও উৎসব পরিচালক আহসান আকবর। অধিবেশন সঞ্চালনায় ছিলেন সাংবাদিক নবনীতা চৌধুরী। প্রখ্যাত শিল্পী মনিরুল ইসলামের শিল্পীজীবন ও তাঁর শিল্প ভাবনা নিয়ে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে কসমিক টেন্টে। 'মনির' শীর্ষক বইটিতে ১৯৬৬ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মনিরুল ইসলামের নির্বাচিত শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে। বইটির প্রকাশনা উপলক্ষে আলোচনা ও শিল্পীর সঙ্গে কথোপকথনে অংশ নেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর ও স্প্যানিশ রাষ্ট্রদূত এদুয়ার্দো ইগলেসিয়া। স্বাগত বক্তব্য দেন এনার্জিস লিমিটেডের পরিচালক জেরিন মাহবুব খান।

উৎসবের শেষ দিনের আয়োজনের সূচনা হয় শাকিরার কণ্ঠে বাহাই গানের অধিবেশনায়। বাংলা, ইংরেজি, ফারসি, আরবি ও হিন্দি ভাষায় ঈশ্বরের বন্দনা করেন এ শিল্পী।

নারীর শক্তি নিয়ে বিশেষ আলোচনা 'গার্ল পাওয়ার'–এ অংশ নেন এভারেষ্ট বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশি নারী নিশাত মজুমদার, মহিলা জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য সালমা খাতুন ও রুমানা আহমেদ এবং ফুটবলার শ্যামলী বসাক। সকাল সোয়া এগারোটায় মূল মঞ্চে নারীর পোশাক নিয়ে 'হোয়াট নট টু ওয়্যার' শীর্ষক অধিবেশনে সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক সাদিয়া লেলভি। আলোচনায় অংশ নেন সামিয়া হক, আমিনা ইয়াকিন, তাকিয়া হোসেন ও হানিয়ুম মারিয়া চৌধুরী। বটতলায় শিশুদের জন্য ছিল গল্প শোনার আসর। কিউ পি আলম 'আশা অ্যান্ড দ্য ম্যাজিক মশারি' গল্পটি পাঠ করেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কেকে টি স্টেজে 'দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাকরিং টু পুতিন' শিরোনামের অধিবেশনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে নিয়ে আলোচনা করেন ব্রিটিশ সাংবাদিক বেন জুহাদ ও বোজামান্ড আবউইন। মূল মঞ্চে 'পোয়েট্রি স্টিল হেয়ার আফটার অল দিস ইয়েটস' শীর্ষক অধিবেশন সঞ্চালনা করেন আমিনা ইয়ামিন। আলোচনায় অংশ নেন পুলিৎজারজয়ী কবি বিজয় শেষাদ্রী, খাদেমুল ইসলাম, জেফরি ইয়াং। বটতলায় বরিশালের মনসা মঙ্গল সম্প্রদায় মঞ্চস্থ করে 'বেগুনা–লখিন্দর'। লনে বসে কবিতা পাঠের আসর বসে। 'সময়ের কবিতা সময়ান্তরের কবিতা' সঞ্চালন করেন কবি মুহম্মদ নুরুল হুদা। কবিতা পাঠ করেন– রুবী রহমান, আসাদ চৌধুরী, ফরিদ কবি, জহুর সেন মজুমদার, তারিক সুজাত, কবির হুমায়ুন প্রমুখ।

'বুক অব ঢাকা' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অরুনাভ সিনহা, কায়সার হক ও কিউনি আলম। সঞ্চালনায় ছিলেন ড্যানিয়েল হান। বটতলায় ছিল প্রয়াত রব ফকির স্মরণে বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান, সংগীত পরিবেশন করেন 'শিকড় বাংলাদেশ'-এর শিল্পীরা। এর মধ্যদিয়ে শেষ হয় ঢাকা লিট ফেস্ট।

জেমকন সাহিত্য পুরস্কার পেলেন দুই লেখক

জেমকন সাহিত্য পুরস্কার পেলেন– কথাসাহিত্যিক মঈনুল আহসান সাহেব ও তরুণ কথাসাহিত্যিক মোস্তাফিজ কারিগর। বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে লেখকদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট ও সনদপত্র ছাড়াও মঈনুল আহসান সাবেরকে ৮ লাখ ও মোস্তাফিজ কারিগরকে ২ লাখ টাকা প্রদান করা হয়। তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ঝর্না রহমান, ভারতের কবি জদুর সেন মজুমদার ও আকবর আহমেদ।

পাগলামি ছাড়া মহৎ কিছু রচনা করা যায় না– ভিএস নাইপল

স্যার ভিদিয়া প্রসাদ নাইপল যিনি সারা দুনিয়ায় ভিএস নাইপল হিসেবে পরিচিত। নাইপলের জন্ম ১৯৩২ সালের ১৭ আগস্ট ক্যারিবিয়ার ত্রিনিদাদে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই লেখকের পিতামহ উত্তর প্রদেশের গোরখপুর থেকে শ্রমিক হিসেবে ত্রিনিদাদে অভিবাসী হোন। লেখাপড়া করেন ব্রিটেনে। তারপর স্বাধীন লেখক হিসেবে জীবন বেছে নেন। মূলত তিনি উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ লেখক। ১৯৭১ সালে তিনি 'ম্যান অব বুকার', ১৯৯০ সালে নাইটহুড ও ২০০১ সালে 'নোবেল সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেন। ভিএস নাইপল যেহেতু ভারতীয় বংশোদ্ভূত তাই ভারত তাকে টানত। ভারতকে নিয়ে এই লেখক তিনটি আলাদা ভ্রমণ কাহিনি লেখেন। ভারতীয় সমাজের টাকা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক বিবর্তনের চিত্র তাঁর রচনায় উঠে এসেছে। তিনি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন সমাজের বৈষম্য ও মানুষের অধিকারের কথা। বিলেতে বসবাস করেও তিনি নিজ দেশ ভারতের প্রতি গভীর ভালোবাসা গভীরভাবে অনুভব করেছেন। দারিদ্র্য ও কষ্টে নাইপল তাঁর শিশুকাল পার করেছেন। ইংল্যান্ডে বসবাসের সময় বেটে, কালো ও শ্বাসকষ্টে ভোগা এই ভারতীয়কে কেউ কোনো কাজে নেয়নি। ২৬ বার চাকরিতে আবেদন করেও কোনো চাকরি পাননি। তাঁর পিতা ছিলেন সাইনবোর্ডের সস্তা চিত্রকর। নাইপল নিজেই স্বীকার করেন পিতাই তাঁর লেখনী জীবনের প্রেরণার উৎস। নাইপল তাঁর আত্মজৈবনিক কথোপকথায় নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর নিজের পিতার ব্যর্থ জীবনের সংগ্রাম, গ্লানি এবং অস্তিত্বের বিস্তৃত বিহ্বলতাকে।

লন্ডনে যখন কঠোর পরিশ্রম আর অর্থকষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন নাইপল, তখন তাঁর কষ্টের সঙ্গী ছিলেন বন্ধু প্যাট্রিসিয়া। পরে প্যাট্রিসিয়াকে বিয়ে করেন তিনি। প্যাট্রিসিয়ার সঙ্গে ৪১ বছর এক সঙ্গে অতিবাহিত করেন। বিবাহিত জীবনে নাইপলের সঙ্গে প্রণয় গড়ে উঠে মর্গারেট মারি নামের বিবাহিতা আরেক অ্যাংলো আর্জেন্টিয়ান নারীর সঙ্গে। যে নারী ছিলেন নাইপলের ভ্রমণসঙ্গী। ক্যান্সারে প্যাট্রিসিয়ার মৃত্যুর পর নাইপল পুনরায় বিয়ে করেন তালাকপ্রাপ্ত পাকিস্তানি সাংবাদিক নাদিরা খানম আলভীকে।

নাইপলের লেখা উপন্যাস এবং ভ্রমণ কাহিনি চমৎকার। গদ্যও সুখাপাঠ্য। কাহিনি বলার ঢংটি চমৎকার। সম্প্রতি নাইপল এসেছিলেন লিট ফেস্ট ঢাকা ২০১৬–এর উদ্‌বোধন করতে। প্রিয় লেখকের কথা শোনা, কাছ থেকে দেখা ও সেলফি তুলে স্থবির পাতাকে সমৃদ্ধ করা ইত্যাদির মধ্যদিয়ে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন বাংলা একাডেমিতে আগত সাহিত্য অনুরাগীরা। মেলায় ২ শতাধিক সাহিত্যিক, সমালোচক প্রকাশকের মাঝে ভিএস নাইপল ছিলেন কেন্দ্রবিন্দুতে। আহসান আকবরের সঞ্চালনায় 'দ্য রাইটার অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক এই অধিবেশনে স্ত্রী লেডি নাদিরা নাইপলকে নিয়ে যোগ দেন ভিএস নাইপল। নাইপল বলেন, আমি লেখক হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কী লিখব, তার কিছুই জানতাম না। আমি বুঝতে পারলাম এরজন্য আমাকে কাঠখড় পোড়াতে হবে। শুরুতে ব্যাপারটা বিব্রতকর ছিল। লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম। নিজের ব্যাপারে নিজেই বিরক্ত হতাম। এক সময় বিবিসি'র লন্ডন অফিসে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করতে গেলাম। টাইপ রাইটার নিয়ে কাজ করতে বসলাম। নিজেকে বললাম আমি এতকাল পর্যন্ত এ ঘর ত্যাগ করব না, যতক্ষণ না পর্যন্ত জানি আমার লেখাটি কী দাঁড়াচ্ছে। এভাবেই নিজের প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করেন নাইপল। নাইপল আরো বলেন, আসলে মহৎ কিছু সৃষ্টির জন্য দরকার পাগলামি। লেখালেখি পাগলামি ছাড়া আর কিছুই না। আর এটাও বলতে হয় কোনোকিছুই খুব সহজ নয়। অনেক চিন্তাভাবনা করে তারপরই একটা কিছু দাঁড়ায়।

মহান বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো

(১৯২৬-২০১৬)

সুফিয়া বেগম

কিউবার মহান বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো চলে গেলেন না ফেরার দেশে। সমাজতান্ত্রিক কিউবার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো। শোষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর সংগ্রামের কথা বিশ্ববাসী আজীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। ২৬ নভেম্বর রাজধানী হাভানায় মারা যান তিনি। তাঁর ভাই প্রেসিডেন্ট রাউল কাস্ত্রো কিউবার জাতীয় টেলিভিশনে এ ঘোষণা দেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল কমিউনিস্ট নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর।

১৯৭৪ সালে আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সম্মেলনে বৈঠক হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সাথে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ফিদেল কাস্ত্রোর অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আদর্শনিষ্ঠ, দৃঢ়তা ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর প্রতি অত্যন্ত সহমর্মী এই মানুষটির সাথে বঙ্গবন্ধুর গভীর সম্পর্ক ছিল।

রাজধানী আলজিয়ার্সে ১৯৭৩ সালে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে (ন্যাম) বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলিঙ্গনকালে ফিদেল কাস্ত্রো একটি ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন– আমি হিমালয় দেখিনি, তবে শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় তিনি হিমালয় তুল্য। আমি তাঁর মধ্যে হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করেছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করে যে ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন এরজন্য বাঙালির হৃদয়ে স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকবেন কাস্ত্রো।

নিষ্পেষিত ও মেহনতি মানুষকে ফিদেল কাস্ত্রো দিয়েছেন সংগ্রামের ভাষা, বিপ্লবের মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছেন মুক্তির পথ। সাম্রাজ্যবাদী ঝড়ের দাপট ঠেকিয়েছেন মাতৃভূমিতে। বলিষ্ঠ হাতে উপড়ে ফেলেছেন পুঁজিবাদদের শেঁকড়। বিশ্বে যখন সাম্রাজ্যবাদের ঝড়ের দাপট তখন দৃঢ় হাতে হাল ধরেন নিজ দেশের, ঠেকালেন পুঁজিবাদকে।

স্বাস্থ্যগত কারণে ২০০৮ সালে ছোটো ভাই রাউল কাস্ত্রোর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব হস্তান্তরের পরে আড়ালে চলে যান কাস্ত্রো।

আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসে একটি যুগের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত কাস্ত্রো। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের একজন অকৃত্রিম ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু। 'এত স্বাধীনতা আপনি আপনার শত্রুদের দিয়েছেন, ওরা একদিন আপনার গাড়ে চেপে বসবে' ১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাপ) শীর্ষ সম্মেলনের সময় বঙ্গবন্ধুকে সতর্ক করেছিলেন, কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো। এই সতর্কতা শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্যই নয়; বাংলাদেশের জন্যও ছিল। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক উদারতার সুযোগে তাঁর শত্রু ও স্বাধীনতা বিরোধীদের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার আশংকা করেছিলেন কাস্ত্রো। দুই বছরের মধ্যে সে আশঙ্কা বাস্তবে রূপ নিল।

বঙ্গবন্ধু ও ফিদেল কাস্ত্রোর মধ্যে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সে বৈঠকের অনেকগুলো ইস্যুর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের বিষয় ছিল। বঙ্গবন্ধু সেই উদ্বেগকে তেমন গুরুত্ব দেননি।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কাস্ত্রো বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ১৯৭৩ সালে ভুট্টো 'ন্যামের' মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। বঙ্গবন্ধু তখন জোরালো ভাবে বলেন– প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্ব বলে আমি কিছু মানি না। বিশ্বে দুটি গোষ্ঠী আছে। এর একটি শোষক অন্যটি শোষিতগোষ্ঠী। কাস্ত্রো এই জাতীয় মন্তব্যে বঙ্গবন্ধুর চেতনার সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করেন। অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরালো করার জন্য বঙ্গবন্ধু-কাস্ত্রো এক সময় রপ্তানি চুক্তি করে। কিউবার নিষেধাজ্ঞার কারণে চিনি বিক্রি করতে পারছিল না আর বাংলাদেশেরও পাট রপ্তানি করার প্রয়োজন ছিল।

আজ বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশ, সেদিন খাদ্য সহায়তা বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কায় রপ্তানি চুক্তি কার্যকর হয়নি।

ফিদেল কাস্ত্রো আধুনিক বিশ্বে একটি যুগের প্রতীক। ৪ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে কাস্ত্রোর দেহভস্ম দক্ষিণ-পশ্চিমের ঐতিহাসিক শহর সান্তিয়াগোতে সমাহিত করা হবে। যেখানে স্কুল ও কলেজ জীবনের লম্বা সময় কেটেছে কাস্ত্রোর। যে শহরের সিটি হলের ব্যালকনি থেকে ১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি কিউবা বিপ্লবের বিজয়ের ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যদিয়ে নিজ দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এক হাতে টানা ৪৯ বছর দেশ শাসন করেন। বিরোধীদের চোখে তিনি ছিলেন 'স্বৈরাচার'। কট্টর পুঁজিবাদী দেশগুলোর কাছে তিনি ছিলেন 'একনায়ক'। বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর কাছে তিনি ছিলেন 'আস্থার প্রতীক'। অনুসারীরা তাকে চিনত 'এল কমাদান্তে' (দ্য কমান্ডার) হিসেবে। আর মুক্তিকামী সংগ্রামী মানুষের কাছে তিনি ছিলেন কিংবদন্তি।

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

মানুষের জন্য আইন, আইনের জন্য মানুষ নয়

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, তরুণ প্রজন্মকে স্বাধীনতা যুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস জানতে হবে। বাঙালির শিকড় কোথায় এটা তোমাদের জানতে হবে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৩ নভেম্বর ২০১৬ টাঙ্গাইলে মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদকপ্রাপ্তদের পদক প্রদান করেন –পিআইডি

১৩ নভেম্বর টাঙ্গাইলে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি একথাগুলো বলেন।

তিনি বলেন, মানুষের জন্য আইন। আইনের জন্য মানুষ নয়। তাই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আপনাদের অব্যাহত প্রয়াস চালাতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, তোমরা এখন গ্র্যাজুয়েট, দেশের মূল্যবান মানব সম্পদ। এজন্য তোমাদের পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি এবং বিশ্ব সমাজের প্রতি তোমাদের দায়দায়িত্ব আরো বেড়ে গেছে।

তিনি আরো বলেন, আমার বিশ্বাস তরুণ প্রজন্ম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেতনা সমুন্নত রেখে সামনে এগিয়ে যাবে। যারা মেধাবী ছাত্রদের জঙ্গি ও সন্ত্রাসী তৎপরতায় জড়িত হতে উস্কানি দিচ্ছে তাদেরকে অবশ্যই শনাক্ত করা হবে এবং পুরোপুরি মূলোৎপাটন করা হবে।

বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী জাতির অহংকার

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, ২১ নভেম্বর সশস্ত্রবাহিনী দিবস। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে তিন বাহিনী সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর উপর সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করে। এর ফলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন ত্বরান্বিত হয়।

২১ নভেম্বর সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি উপরিউক্ত কথাগুলো বলেন।

তিনি বলেন, সশস্ত্রবাহিনী দিবসে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি শত জেল-জুলুম উপেক্ষা করে সমগ্র জাতিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি কাঙ্ক্ষিত বিজয়।

রাষ্ট্রপতি বলেন, এ দিনে আমি দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের জন্য শাহাদতবরণকারী মুক্তিযোদ্ধাসহ সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং যুদ্ধাহত ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা। মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান ও বীরত্বগাথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

তিনি আরো বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী জাতির অহংকার। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী একটি উঁচু পেশাদার, দক্ষ ও সুশৃঙ্খল বাহিনী। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যে-কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাসহ জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যগণ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। **প্রতিবেদন : মেজবাউল হক**

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ নভেম্বর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৪ প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সমবায় অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকারের পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করার আহ্বান জানান এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে উল্লেখ করেন। তিনি সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতার কাজ করার নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনকালেই জাতির পিতা সমবায়ের মাধ্যমে এদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি সংবিধানে সমবায়কে রাষ্ট্রীয় সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। পরে তিনি ১০টি ক্যাটাগরিতে ৫ জন ব্যক্তি ও ৫টি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৪ প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ নভেম্বর নাজিমুদ্দিন রোডের সাবেক কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতা স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘরের সামনে রক্ষিত বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তিতে

৫ নভেম্বর ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৪-এর পদকপ্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ নভেম্বর ২০১৬ নাজিমুদ্দিন রোডে প্রাক্তন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করেন। তাঁর বোন শেখ রেহানা এ সময় উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহান স্থপতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পরে তিনি চার নেতার প্রতিও শ্রদ্ধা জানান।

৬৪ উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণের প্রস্তাব একনেকে অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ নভেম্বর সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে বেকার তরুণ-তরুণীদের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দেশের আরো ৬৪ উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণের প্রস্তাব অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, পঞ্চম থেকে সপ্তম পর্যায়ে ২০টি করে ৬০ উপজেলায় এই কর্মসূচি চালু হবে। এরসঙ্গে বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির দুটি করে এবং রাঙামাটির একটি উপজেলা যোগ হয়ে মোট ৬৪ উপজেলায় এই কর্মসূচি সম্প্রসারিত হবে। এছাড়া 'পল্লি সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৬'–এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনও দেওয়া হয় এই বৈঠকে।

পরিবেশ রক্ষায় জৈব কৃষিনীতি অনুমোদন

মাটির গুণাগুণ ও কৃষি পরিবেশ রক্ষায় জৈব কৃষিনীতি করছে সরকার। এলক্ষ্যে 'জাতীয় জৈব কৃষিনীতি, ২০১৬'–এর খসড়া অনুমোদন লাভ করে। ৭ নভেম্বর সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এই খসড়ার অনুমোদন দেওয়া হয়।

মারাকাস জলবায়ু সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ নভেম্বর ২২তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য মরক্কোয় পৌঁছেন। তিনি ১৫ নভেম্বর (বাংলাদেশ সময় ভোররাত) মারাকাস জলবায়ু সম্মেলনের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের যুদ্ধে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার আহ্বান জানান। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ হুমকির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব সুসংহত করার লক্ষ্যে সবাইকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার কথা উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী ১৫ তারিখ সন্ধ্যায় হাই লেভেল সেগমেন্টে অংশগ্রহণ করেন। এসময় বক্তব্যকালে প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু উদ্বাস্তুদের অভিবাসনের ব্যাপারে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আর্কষণ করেন। তিনি জলবায়ু তহবিলে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে দ্রুত তহবিল দিতে আহ্বান জানান।

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিভাগের সর্বসাধারণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তির উদ্‌বোধন ও সমুদ্র মৎস্য গবেষণা এবং অনুসন্ধান জাহাজ আরভি মিন সন্ধানীর কমিশনিং প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ার শান্তিপূর্ণ দেশ। এখানে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের কোনো ঠাঁই হবে না। এলক্ষ্যে সকলকে সম্মিলিতভাবে জনমত সৃষ্টির আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

চিকিৎসা কেবল পেশা নয়, মহান ব্রত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ নভেম্বর হোটেল র‍্যাডিসন ব্লুতে অ্যাসোসিয়েশন অব থোরাসকি অ্যান্ড কার্ডিওভাসকুলার সার্জনস অব এশিয়া'র (এটিসিএসএ) ২৬তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী চিকিৎসকদের উদ্দেশে বলেন, চিকিৎসা শুধু একটি পেশা নয়, এটি একটি মহান ব্রত। তিনি মানুষের জন্য কাজ করার এবং রোগীকে পরিবারের সদস্য মনে করার চিকিৎসকদের প্রতি নির্দেশ দেন। তিনি মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে তাঁর সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন এবং আগামীতে রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরো দুটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে আয়োজিত জাতীয় কর্মশালার উদ্‌বোধন

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (সিইজিআইএস) 'সবার জন্য নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ নভেম্বর তাঁর

১৫ নভেম্বর ২০১৬ মরক্কোর মারাকাসে প্লেনারি হলে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনফারেন্সের High Level Segment of COP 22-এর উদ্‌বোধন অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –পিআইডি

তেজগাঁও কার্যালয়ে এই কর্মশালার উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আইন ও বিধিবিধানের পরিবর্তন এবং সময়োপযোগী অসংখ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে জেলা-উপজেলা থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ডভিত্তিক তৃণমূলের প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তিনি সবার জন্য নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিতকরণসহ এসডিজি-৬ অর্জনে বাংলাদেশকে বিশ্বে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠার জন্য কৌশলপত্র তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। **প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম**

তথ্যমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

তথ্য যাচাই করে পরিবেশন করা গণমাধ্যমের পবিত্র দায়িত্ব

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১০ নভেম্বর ঢাকার বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বাংলাদেশ সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদক পরিষদের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় বলেন, গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে দায়িত্বশীলতার সাথে তার কাজ করবে, জনগণ ও সরকার এটাই আশা করে। সরকারের তল্পিবাহক হওয়া বা অন্যদিকে জঙ্গির সঙ্গীদের ওকালতি করা কোনোটাই গণমাধ্যমের কাজ নয়।

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার ওপর গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী বলেন, তথ্যের সঠিকতা যাচাই করে পরিবেশন করা গণমাধ্যমের পবিত্র দায়িত্ব। রাগ-অনুরাগ বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হওয়া গণমাধ্যমের কাজ নয়। গণমাধ্যমের পবিত্রতা রক্ষা করার মূল দায়িত্ব গণমাধ্যম কর্মীদেরই।

মতবিনিময় সভায় পরিষদের মহাসচিব সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদকদের জন্য সরকারি প্লট বরাদ্দ, বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ, পরিবারের সদস্যদের বিশেষ শিক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা, সরকারি মিডিয়া তালিকভুক্তি ছাড়াও তথ্য অধিদপ্তরের অ্যাক্রেডিটেশনকার্ড প্রদানের দাবিসহ ১৪ দফা দাবি উপস্থাপন করেন। তথ্যমন্ত্রী দাবিগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আইনসিদ্ধ পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

দেশ ও সভ্যতার কল্যাণে আত্মনিয়োগের মাঝেই জীবনের সার্থকতা

তথ্যমন্ত্রী ১০ নভেম্বর ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল একাডেমির প্রাক্তন শিক্ষার্থী পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বলেন, অন্যের আদলে নয়, নিজের মতো করে গড়তে হবে জীবন।

উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, নিজের শিক্ষা ও অর্জনের ওপর আস্থা রেখে এবং কোনো ব্যর্থতায় হতোদ্যম না হয়ে দেশ ও সভ্যতার কল্যাণে আত্মনিয়োগের মাঝেই জীবনের সার্থকতা।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ২১ নভেম্বর ২০১৬ সেগুনবাগিচাস্থ বাগিচা রেস্টুরেন্ট-এর প্লাটিনাম হলে 'বিশ্ব টেলিভিশন দিবস' উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন –পিআইডি

দেশজ সংস্কৃতি রক্ষায় সরকার অগ্রণী ভূমিকা রাখবে

তথ্যমন্ত্রী ২২ নভেম্বর ঢাকার বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট সেমিনার কক্ষে নবগঠিত ফেডারেশন অব টেলিভিশন প্রফেশনালস অর্গানাইজেশন (এফটিপিও)-এর প্রতিনিধিদের সাথে এক বৈঠকে বলেন, দেশজ সংস্কৃতি এবং টেলিভিশনে পেশাজীবীদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টেলিভিশনসহ গণমাধ্যমের অভূতপূর্ব বিকাশকে অব্যাহত রাখতে তথ্য মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর। দেশজ সংস্কৃতি বুকে ধরে দেশের টেলিভিশন পেশাজীবীরা যাতে সংস্কৃতির শক্তিশালী বাহন হিসেবে কাজ করতে পারেন, সরকার সে বিষয়ে যত্নবান।

গণতন্ত্রের অর্থ আইনের শাসন

তথ্যমন্ত্রী ২১ নভেম্বর 'বিশ্ব টেলিভিশন দিবস ২০১৬' উপলক্ষে রাজধানীর সেগুন বাগিচায় একটি হোটেলে মিডিয়া মিউজিয়াম অব বাংলাদেশ আয়োজিত 'সম্প্রচার সাংবাদিকতার উন্নয়ন অগ্রগতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনাসভায় বলেন, জঙ্গিমুক্ত শান্তির বাংলাদেশ ও বিশ্ব গড়তে টেলিভিশন অপরিমেয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম; টেলিভিশনের একটি ছবি অনেক সময়েই দীর্ঘ বক্তৃতার চেয়ে মূল্যবান।

গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমকে হাতের এপিঠ ওপিঠ বর্ণনা করে মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ চলছে। গণতন্ত্রের অর্থ আইনের শাসন। তাই গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের নিরাপত্তা বিধানে আইনকানুন আবশ্যক। সরকার সম্প্রচার নীতিমালা করেছে, আশা করি ২০১৭ সালের প্রথম দিকেই সম্প্রচার আইন, আধাবিচারিক কমিশন এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া অন্তর্ভুক্ত করে ওয়েজবোর্ড প্রণীত হবে। **প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন**

আমাদের স্বাধীনতা : বিশেষ প্রতিবেদন

পহেলা ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধা দিবস ঘোষণার আহ্বান

পহেলা ডিসেম্বর জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা দিবসের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি যথার্থ দাবি। এ দাবি সরকারের কাছে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হবে। বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী। সুতরাং পহেলা ডিসেম্বর জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা দিবস ঘোষণা এখন সময়ের দাবি। এ দাবি আদায়ে আমরা সফল হব।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ১ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে পহেলা ডিসেম্বর জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা দিবস ঘোষণার দাবি সংক্রান্ত এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন মঞ্চের আয়োজনে ও চেতনা বাস্তবায়ন প্রজন্ম মঞ্চের সহযোগিতায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন মঞ্চের সভাপতি ও নৌপরিবহণ মন্ত্রী শাজাহান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুল মালেক মিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) ওয়াকার হাসান, মো. কবির আহমদ খান, ইসমত কাদির গামাসহ প্রজন্ম মঞ্চের মো. নজরুল ইসলাম বাচ্চু, কেএম মুজিবুর রহমান মজনু ও মো. ইসা হক।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ১ ডিসেম্বর ২০১৬ জাতীয় প্রেস ক্লাবের অডিটোরিয়ামে মুক্তিযোদ্ধা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন –পিআইডি

শাজাহান খান বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সকল দাবির প্রতি বর্তমান সরকার সংবেদনশীল। অতি শীঘ্রই মুক্তিযোদ্ধা দিবসটি সরকারি ভাবে পালিত হওয়া উচিত। তবে শত্রু পক্ষ কিন্তু বসে নেই। আমাদের সকলকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ ও জনগণের অতন্দ্র প্রহরীর কাজটি অব্যাহত রাখতে হবে। আর এ দায়িত্ব শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের নয়, নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে।

দিনের প্রত্যুষে শিখা চিরন্তনে শ্রদ্ধা নিবেদন ও র‍্যালির মাধ্যমে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি। দিবসটিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পালনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

এছাড়া, বিজয়ের মাসের প্রথম দিন পহেলা ডিসেম্বরকে মুক্তিযোদ্ধা দিবস হিসেবে ঘোষণার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু।

১ ডিসেম্বর ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে প্রজ্জ্বলিত শিখা চিরন্তনে জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মাননা, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের শপথ গ্রহণ শেষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'বিজয়ের মাসের প্রথম দিনে প্রয়াত ও জীবিত সকল মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করে তাদের প্রতি দেশবাসী শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। এ দিনটিকে মুক্তিযোদ্ধা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে দেশব্যাপী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টিকে একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত করা হোক।'

'মুক্তিযোদ্ধা দিবসে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মান আর রাজাকারদের জন্য ঘৃণা' উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ রাজাকার ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের কবল থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এগিয়ে চলেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে মুক্তিযোদ্ধা দিবসের ঘোষণা হবে একটি সময়োচিত পদক্ষেপ।'

এর আগে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে দাবি উত্থাপন এবং শপথ বাক্য পাঠ করান মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার ফোরামের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) শফিউল্লাহ। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি জাতীয় ইতিহাসে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি অমর করার লক্ষ্যে এদিনকে মুক্তিযোদ্ধা দিবস হিসেবে সরকারি ঘোষণার আহ্বান জানান। **প্রতিবেদন : আসিফ রহমান**

জাতীয় যুব দিবস ২০১৬

১ নভেম্বর : প্রতিবছরের ন্যায় এবারো সারাদেশে বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে 'জাতীয় যুবদিবস ২০১৬'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'আত্মকর্মী যুব শক্তি, টেকসই উন্নয়নের মূল ভিত্তি'

❑ যুবসমাজের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধনকালে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকাসক্তি থেকে দূরে থেকে যুবসমাজকে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

❑ আয়কর মেলা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ১-৭ নভেম্বর দেশব্যাপী আয়কর মেলা অনুষ্ঠিত হয়

❑ জেএসসি– জেডিসি পরীক্ষা শুরু

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের 'জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট' (জেএসসি) ও 'জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট' (জেডিসি) পরীক্ষা সারা দেশে শুরু হয়

জেল হত্যা দিবস পালিত

৩ নভেম্বর : বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে 'জেল হত্যা দিবস'

জাতীয় সমবায় দিবস

৫ নভেম্বর : 'সমবায়ের দর্শন, টেকসই উন্নয়ন'– এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশব্যাপী '৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস' উদ্‌যাপিত হয়

সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

❑ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে '৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস পালন' ও 'জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৪' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমবায় আন্দোলন আরো জোরদার করার আহ্বান জানান

মন্ত্রিসভার বৈঠক

৭ নভেম্বর : সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেকার তরুণ–তরুণীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থানে দেশের আরো ৬৪ উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এছাড়া 'পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৬' এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন ২০১৬– এর খসড়ার অনুমোদন দেওয়া হয়

বিশ্ব রেডিওগ্রাফি দিবস পালিত

৮ নভেম্বর : বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং টেকনোলজিস্ট শেরেবাংলা নগর জোনাল কমিটি নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে 'বিশ্ব রেডিওগ্রাফি দিবস'

একনেক বৈঠক

১০ নভেম্বর : একনেক সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে নৌপথ খননসহ ১২ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। এতে ব্যয় হবে ৯ হাজার ৬৬৪ কোটি টাকা

ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী

১২ নভেম্বর : গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীকে উন্নয়নের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার আহ্বান জানান

বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস'। এই বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'আমরা এখনো নিউমোনিয়ার সঙ্গে আছি'

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত

১৪ নভেম্বর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে 'বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস'। এই বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল-'ডায়াবেটিসের ওপর দৃষ্টি দিন; অন্ধত্ব এড়াতে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন'

জাতীয় নৃত্যনাট্য উৎসব

❑ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে দ্বিতীয় জাতীয় নৃত্যনাট্য উৎসবের উদ্‌বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত

জলবায়ু সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

১৫ নভেম্বর : মরক্কো মারাকাসে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের (কপ-২২) উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বক্তব্যকালে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় উন্নত দেশগুলো যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা পূরণের আহ্বান পুনর্বার জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আইটিইউ পুরস্কার পেল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্প

১৭ নভেম্বর : দেশের প্রথম স্যাটেলাইট প্রকল্প বঙ্গবন্ধু-১ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থার (আইটিইউ) পুরস্কার পায়। উদ্ভাবনী তথ্যপ্রযুক্তি সেবার স্বীকৃতি হিসেবে 'রিকগনিশন অব এক্সিলেন্স' পুরস্কার পায় সরকারের অগ্রাধিকার তালিকার এ প্রকল্পটি। থাইল্যান্ডে আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড ২০১৬ সম্মেলনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিমের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আইটিইউ মহাসচিব হাওলিন ঝাও

শান্তি প্রতিষ্ঠায় সবাইকে পাশে চাই প্রধানমন্ত্রী

১৯ নভেম্বর : গণভবন থেকে চট্টগ্রাম বিভাগের ১১ জেলার মানুষের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠায় সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

চিকিৎসকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

হোটেল র‍্যাডিসন ব্লুতে 'অ্যাসোসিয়েশন অব খোরাসিক অ্যান্ড কার্ডিওভাসকুলার সার্জনস অব এশিয়া'র (এটিসিএমএ) ২৬তম বার্ষিক সম্মেলন উদ্‌বোধনের সময় প্রধান অতিথির ভাষণে রোগীকে নিজের পরিবারের সদস্য মনে করে যত্নের সঙ্গে চিকিৎসা সেবা দিতে চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা শুরু

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ নভেম্বর ২০১৬ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মৎস্য ও ফিশারিজ জরিপ এবং অনুসন্ধানী জাহাজ 'RV Meen Shandhani' -এর কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩ নভেম্বর ২০১৬ জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে দলীয় নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন –পিআইডি

২০ নভেম্বর : চলতি বছরের প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়। এতে অংশগ্রহণ করে ৩২ লাখ ৩০ হাজার ২৮৮ শিক্ষার্থী

যথাযথ মর্যাদায় সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপিত

২১ নভেম্বর : যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে 'সশস্ত্র বাহিনী' দিবস উদযাপিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ঢাকা সেনানিবাসের শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন

সেনাকুঞ্জে সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে সেনাকুঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সশস্ত্র বাহিনীকে কখনো ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করিনি

একনেক বৈঠক

২২ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) নিয়মিত বৈঠকে অবকাঠামো খাতের মোট ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়। ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হবে ২২ হাজার ৮৭৬ কোটি ৩১ লাখ টাকা

সেনা সদস্যদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

২৩ নভেম্বর : সিলেটের জালালাবাদ সেনানিবাসে ১৭ পদাতিক ডিভিশনের অধীন ১১ পদাতিক ব্রিগেডসহ ৯টি ইউনিটের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেনাবাহিনীর সদস্যদের দেশের সংবিধান ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সদা সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন

মন্ত্রিসভার বৈঠক

২৪ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলের বয়স ২১ ও মেয়ের কমপক্ষে ১৮ নির্ধারণ করে বাল্যবিয়ে বিরোধ আইন ২০১৬ খসড়া আইনটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। এছাড়া সরকারি ছুটির তালিকাও অনুমোদন দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন : আখতার শাহীমা হক

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতিসংঘের মিশন থেকে পুলিশের প্রবৃদ্ধি

জাতিসংঘের মিশনের ২১টি দেশের কাজ করে পুলিশ বাহিনী ৩৫ হাজার কোটি টাকা আয় করেছে। বর্তমানে জাতিসংঘের হয়ে পুলিশের ১১৫৮ জন সদস্য বিশ্বের ৮টি দেশে নিয়োজিত। জাতিসংঘ আরো বাংলাদেশ পুলিশ চেয়ে চাহিদাপত্র দিয়েছে।

পর্যটকের নিরাপত্তায় ট্যুরিস্ট পুলিশ

বাংলাদেশ পর্যটন অঞ্চলগুলোতে ট্যুরিস্ট পুলিশ নিরাপত্তা দিতেই গঠিত হয়েছিল ট্যুরিস্ট পুলিশ। এতদিন ট্যুরিস্ট সীমিত আকারে সেই দায়িত্ব পালন করে আসছে। তবে এখন থেকে পর্যটকদের সার্বক্ষণিক

নিরাপত্তা দিবে তারা। ট্যুরিস্ট পুলিশ পর্যটকদের নিরাপত্তা দেওয়া থেকে শুরু করে পর্যটকদের থাকার জায়গারও নিরাপত্তা দিবে। পর্যটকরা যাতে নির্ভয়ে দর্শনীয় স্থানে যেতে পারে সে জন্য থাকবে আলাদা নজরদারি। পোশাকধারী পুলিশের পাশাপাশি সাদা ট্যুরিস্ট পুলিশরাও পর্যটকদের খোঁজখবর রাখবেন। পর্যটকদের নিরাপত্তায় ব্যবহারের জন্য ৬৫টি যানবাহনের অনুমোদন দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে সাগরে নিরাপত্তার জন্য বিচ রেসকিউ মোটর বাইক, রেসকিউ বোটসহ জাহাজও রয়েছে।

নাটোরে প্রথম প্রক্রিয়াজাত শিল্পাঞ্চল

দেশের প্রথম খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পাঞ্চল হবে নাটোরে। বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় এই শিল্পাঞ্চল করার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। চতুর্থ বাপা ফুডপ্রো ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো-২০১৬–এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম একথা জানান। একসময় দেশে খাদ্য ঘাটতি থাকলেও বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে গত আট বছরে খাদ্যে বিপ্লব ঘটেছে। খাদ্য আমদানি কমিয়ে রপ্তানি হচ্ছে। গত বছর খাদ্য রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। দেশের প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করে বাজার বহুমুখীকরণের জন্যই শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

জামদানি শাড়ি নিবন্ধন সনদ পেয়েছে

বাংলাদেশের প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে নিবন্ধন পেয়েছে জামদানি। বাঙালির ঐতিহ্যবাহী পণ্য জামদানি মসলিনের পঞ্চম সংস্করণ। একে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে নিবন্ধনের মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্যগত সুরক্ষার পথে বাংলাদেশ আরেক ধাপ এগিয়ে গেল।

রেমিটেন্স পাঠাতে নতুন নির্দেশনা

দেশ থেকে বাইরে যাওয়া রেমিটেন্স আবার ফেরত এলে অথবা বিদেশ থেকে আসা রেমিটেন্স আবার ফেরত গেলে সেই তথ্য আলাদাভাবে উল্লেখ করে নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে পাঠাতে বলা হয়েছে ব্যাংকগুলোকে। এ লক্ষ্যে নতুন ফরম সংযুক্ত করে একটি সার্কুলার জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন বিভাগ। ওই সার্কুলারে বলা হয়েছে যথাযথভাবে ইস্যুকৃত সি-ফরম ও টিএম ফরমের ওপরে ডান দিকে যথাক্রমে 'ইনওয়ার্ড আইডি' ও 'টিএম আইডি' শিরোনামে অনলাইন থেকে প্রাপ্ত 'ট্রানজেকশন আইডি' সন্নিবেশিত করার নির্দেশনা দেওয়া হলো। প্রাথমিকভাবে দেশের বাইরে যাওয়া রেমিট্যান্স পরবর্তী সময়ে দেশে আনা হলে অথবা বিদেশ থেকে আসা রেমিটেন্স পরবর্তী সময়ে ফেরত পাঠানো হলে অনলাইন ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স মনিটরিং সিস্টেমে নির্দেশিত 'আউটওয়াড রেফারেন্স' শিরোনামে এবং অনলাইন টিএম ফরম মনিটরিং সিস্টেমে নির্দেশিত 'ইনওয়ার্ড রেফারেন্স' শিরোনামে এবং সংযোজিত হার্ড কপি সি-ফরমের নমুনায় নির্দিষ্ট ঘর পূরণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। **প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ**

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

এক দশকে নারী জনশক্তি রপ্তানি বেড়েছে ছয়গুণ

গত ১০ বছরে বিভিন্ন দেশে নারী শ্রমিক রপ্তানি বেড়েছে ছয় গুণ। ২০০৬ সালে বিদেশে প্রেরিত নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৮ হাজার ৪৫ জন। আর ২০১৫ সালে এসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক লক্ষ তিন হাজার ৭১৮ জনে। অর্থাৎ এক দশকে বিদেশে নারী শ্রমিক যাওয়ার হার ছয়গুণ বেড়েছে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য থেকে এসব কথা জানা যায়।

মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিদেশে পাঠানো হয়েছে ৯১ হাজার ৪৪৮ জন নারীকে। এর মধ্যে শুধু সৌদি আরবেই গেছেন ৫২ হাজার ৬২৬ জন। জর্দানে ১৭ হাজার ৩২৫, ওমানে ১০ হাজার ১২০, কাতারে চার হাজার ৪৬০ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে চার হাজার ৭৬ জন নারী কর্মী পাঠানো হয়েছে। নারী কর্মী রপ্তানি বাড়ার পেছনে যে কারণগুলো রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– খুব কম খরচে বিদেশে যাওয়া যায় এবং থাকা-খাওয়া ও চিকিৎসা ব্যয় বহন করে থাকেন।

উল্লেখ্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী, 'নিরাপত্তা সঙ্গী; ও 'বোনাস' হিসেবে প্রতিজন নারীর সঙ্গে যেতে পারছেন দুজন পুরুষ কর্মীও।

ইউনেস্কো জুরি বোর্ডের সভাপতি পুতুল

প্যারিসে ইউনেস্কো দপ্তরে 'ইউনেস্কো-আমির জাবের আল-আহমদ আল-সাবাহ পুরস্কার' সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। সম্প্রতি প্যারিস থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ইউনেস্কো মহাপরিচালক মনোনীত করার পর জুরি বোর্ডের অন্য সদস্যরা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে আগামী দুই বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত করেন।

উন্নত ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে

ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে বক্তব্য রাখছেন অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি সায়মা ওয়াজেদ পুতুল

স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য 'ইউনেস্কো-আমির জাবেদ আল-আহমদ আল-সাবাহ' পুরস্কারটি চালু হয়।

ফায়ার সার্ভিসে প্রথম নারী স্টেশন অফিসার

ফায়ার সার্ভিসের প্রথম নারী স্টেশন অফিসার হিসেবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তিন জন নারী। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্ট ট্রেনিং কমপ্লেক্সে প্রশিক্ষণরত এই তিন নারী হলেন লিমা খানম, খালেদা ইয়াসমিন ও লাসমিন সুলতানা।

২৪ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই প্রশিক্ষণে ১৫৪ জন অফিসারের মধ্যে নারী তিন জন। আগুন নেভানো, আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলছে তাদের।

লিমা খানম সমাজকর্মে স্নাতকোত্তর, খালেদা ইয়াসমিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর এবং লাসমিন সুলতানা রসায়নে স্নাতকোত্তর শেষ করে যোগ দেন কঠিন ও গৌরবজনক এ পেশায়। উচ্চতার মাপ ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি থেকে কমিয়ে ৫ ফুট ২ ইঞ্চি করলে আরো অধিক সংখ্যক নারী এ পেশায় আসবেন বলে অনেকে মনে করেন।

স্মার্ট বাস

তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীদের প্রশিক্ষণ দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি উদ্বোধন করেছেন স্মার্ট বাস সার্ভিস। শব্দ ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই বাসগুলোয় দেশের প্রত্যন্ত এলাকার ১ লক্ষ ৬৬ হাজার নারী তথ্যপ্রযুক্তির প্রশিক্ষণ পাবেন। সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ, মোবাইল ফোন অপারেটর রবি ও চীনের ওয়াওয়ে টেকনোলজিস বাংলাদেশ লিমিটেড যৌথভাবে এই বাস প্রশিক্ষণ চালু করেছে।

'টেকসই নারী উন্নয়নে আইসিটি' প্রকল্পে স্মার্ট বাসের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতেই চালু হয়েছে তিন বছর মেয়াদি এ প্রকল্প। দেশের সব জেলায় যাবে এই বাস, যাবে একদম গ্রামগঞ্জে। স্থানীয় প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই বাসে ২৫টি আসনের সামনে আছে একটি করে টেবিল এবং প্রতিটি টেবিলেই আছে একটি করে নামি ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ। সাউন্ডপ্রুফ এই বাসে আছে ওয়াই-ফাই সুবিধা, আধুনিক নিরাপত্তা ও অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, মেশিন ডিটেক্টর ও অ্যালার্মিং সিস্টেম ও জরুরি নিগর্মন ব্যবস্থা।

গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যায় স্মার্ট চুড়ি

গর্ভবতী মা ও অনাগত সন্তানের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দেশে তৈরি হয়েছে উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট চুড়ি। এই চুড়ি হাতে থাকলে গর্ভধারণের পুরো সময় মাকে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক বার্তা শোনাবে এবং ক্ষতিকর মাত্রার ধোয়ার ব্যাপারে সতর্ক করবে। এটি তৈরি করেছে গ্রামীণ ইনটেল সোশ্যাল বিজনেস লিমিটেড।

০.৮ ইঞ্চি চওড়া ও ০.৩ ইঞ্চি পুরু প্লাস্টিকের এই চুড়িতে থাকবে মাইক্রোচিপ, মেমোরি কার্ড, স্পিকার, ব্যাটারি, কার্বন মনোক্সাইড শনাক্তের জন্য সেন্সর এবং এলইডি বাতি। গর্ভকালের প্রতিটি সপ্তাহের উপযোগী করে সেট করা বার্তাগুলো মা সপ্তাহে দুবার শুনতে পাবে। আবার পাবে আরো প্রয়োজনীয় তথ্য। রান্নাঘরে বা অন্য কোথাও ক্ষতিকর মাত্রার কার্বন মনোক্সাইড থাকলে চুড়িতে থাকা এলইডি বাতি জ্বলে উঠবে এবং আপনাকে দরজা-জানালা খুলতে অথবা নির্মল বায়ু আছে এমন স্থানে যেতে অনুরোধ করা হবে। উল্লেখ্য অল্প কিছুদিনের মধ্যে এটি বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস হলে মহাপরিচালক মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খানের সভাপতিত্বে সম্প্রতি CEDAW-এর ৮ম পিরিয়ডিক-এর আওতায় 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং যৌন হয়রানি বন্ধ কার্যক্রম' শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এই কর্মশালায়–কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা, কর্ম পরিবেশ, পরিবারের সঙ্গে কর্মস্থলের সমন্বয় সাধনসহ নারী ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

কর্মশালার উদ্বোধন করে মহাপরিচালক CEDAW সনদের বাস্তবায়নকল্পে নারী-পুরুষ সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি কর্মস্থলে কোনো নারী নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হলে তা এই অধিদপ্তরের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির কাছে অভিযোগ করতে পরামর্শ দেন।

অধিদপ্তরের নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লিনা হাসিনা হক। তিনি কর্মস্থলে নারীর কর্মপরিবেশ নিয়ে উপস্থিত নারীদের সঙ্গে উন্মুক্ত মতবিনিময় করেন।

উল্লেখ্য, উপপরিচালক (প্রশাসন) হাসিনা আক্তার তার বক্তৃতায় এ অধিদপ্তরের গঠিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন।

এর আগে নারী ও কন্যা শিশু ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নির্মিত মো. জাফর আহম্মেদ প্রযোজিত 'অর্ধেক আকাশ' নামে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। **প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী**

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

নতুন প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষায় শিক্ষিত করার আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১২ নভেম্বর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) আয়োজিত ২০১৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনকারী সদস্য সন্তানদের সংবর্ধনা ও বৃত্তি প্রদান এবং ডিআরইউতে 'আমরা' নেটওয়ার্কের ফ্রি ওয়াই-ফাই জোনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালে মন্ত্রী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে নতুন প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের গ্লোবাল ভিলেজের নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাদের জন্য বিশ্বমানের শিক্ষা এবং প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে। কারণ শিক্ষার মান বাড়িয়ে

বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যাওয়াই এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ। পরে তিনি কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা সনদ, ক্রেস্ট ও বৃত্তির টাকা তুলে দেন।

শিক্ষার মান বাড়াতে মাধ্যমিক শিক্ষকদের আইসিটি প্রশিক্ষণ শুরু

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইজ)-এর উদ্যোগে শিক্ষার মান বাড়াতে সারা দেশের সব মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তির (আইসিটি) বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে দেশের ১২৫টি উপজেলার সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৬০টি উপজেলায় এবং তৃতীয় পর্যায়ে ২০৪টি উপজেলায় অবকাঠামো গড়ে তুলে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আগামীতে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদেরও এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগতমান নিশ্চিতে শিক্ষকদের ভূমিকাই মুখ্য

ইউনেস্কোর ৭১ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৬ নভেম্বর ফার্মগেটে আইএইচডি সম্মেলন কক্ষে শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় বক্তারা শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগতমান নিশ্চিত করতে শিক্ষকরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে বলে উল্লেখ করেন।

সম্মিলিতভাবে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিভাগের সর্বসাধারণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তির উদ্‌বোধন এবং সমুদ্র মৎস্য গবেষণা ও অনুসন্ধান জাহাজ আরভি মিন সন্ধানীর কমিশনিং প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ার শান্তিপূর্ণ দেশ। এখানে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের কোনো ঠাঁই হবে না। এলক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে সবাইকে জনমত সৃষ্টির আহ্বান জানান। শিক্ষক এবং অভিভাবকদের উদ্দেশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছেলেমেয়েরা কার সঙ্গে মিশে, কোথায় যায় তার খোঁজ রাখা, তারা যেন সঠিক পথে থাকে এবং মন খুলে মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারে সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে। শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, কোনো শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে তারা কী করছে, তারা কোনো সন্ত্রাসীর সঙ্গে মিশছে কি-না সেদিকে নজর দিন। সেখান থেকে তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন। এছাড়া কোরান-হাদিসে বর্ণিত ইসলামের শান্তির বাণী বার বার জনগণের সামনে তুলে ধরতে ইমামদের প্রতিও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। **প্রতিবেদন : মো. সেলিম**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ নভেম্বর ২০১৬ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন –পিআইডি

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

আন্তরিকতা নিয়ে প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

৩ ডিসেম্বর ২৫তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পালিত হয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশে দিবসটি 'জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস' হিসেবেও পালন করা হয়। এবার পালিত হয়েছে ১৮তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে দিবসটি পালিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিবসটি উপলক্ষে পৃথক বাণী দিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক এ দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য হয়েছে 'অ্যাচিভিং ১৭ গোলস ফর দ্য ফিউচার উই ওয়ান্ট' অর্থাৎ টেকসই 'ভবিষ্যৎ গড়ি, ১৭ লক্ষ্য অর্জন করি।' এই প্রতিপাদ্য যেমন এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে, তেমনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়সংগত বিশ্ব নির্মাণে ভূমিকা রাখবে।

উন্নয়নের মূলধারায় প্রতিবন্ধীদের একীভূতকরণ এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করেছে।

প্রতিবন্ধীদের সামাজিক মর্যাদা, অধিকার ও কল্যাণের জন্য সহযোগিতা করা বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালনের লক্ষ্য।

১৯৯২ সাল থেকে বিশ্বে ৩ ডিসেম্বর পালিত হয়ে আসছে 'বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস'।

জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার। সেটা হতে পারে শারীরিক বৈকল্য, ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় বৈকল্য, বুদ্ধিবৃত্তিক বৈকল্য কিংবা মানসিক অসুস্থতা। নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে তাদের জীবন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের মতো নয়।

আন্তরিকতা নিয়ে প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়ান : প্রধানমন্ত্রী

৩ ডিসেম্বর রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২৫তম আন্তর্জাতিক ও ১৮তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী আন্তরিকতা ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

সরকার সব প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধকে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনতে জীবনচক্র ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩ ডিসেম্বর ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২৫তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৮তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের খোঁজখবর নেন –পিআইডি

বলে জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিবন্ধীরা আমাদের আপনজন, আমাদেরই সন্তান। কাজেই তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া, সমাজে তাদের একটা সম্মানজনক অবস্থান সৃষ্টি করা এবং তাদের আরও সুন্দরভাবে বাঁচার সুযোগ করে দেওয়াই আমাদের কর্তব্য। প্রতিবন্ধীদের সহায়তায় বিত্তবানদের এগিয়ে আসারও আহ্বান জানান তিনি। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা বলেন, প্রতিটি স্কুলে প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে আর দশটা স্বাভাবিক শিশুর সঙ্গে মিশে তারা শিখতে পারে। সমাজের মূল ধারায় সম্পৃক্ত হতে পারে।

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো: নুরুজ্জামান আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের সভাপতি এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জিল্লুর রহমান।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনটি ক্যাটাগরিতে নয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মধ্যে ক্রেস্ট ও সনদপত্র বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানস্থল থেকে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনিসুল হকের সঙ্গে কথা বলে মিরপুর-১৪ নম্বর সেকশনে আটদিনব্যাপী প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত 'প্রতিবন্ধী উত্তরণ মেলা' উদ্‌বোধন করেন।

পঁচাত্তরে পরিবারের সবাইকে ও সবকিছু হারানোর পরও দেশে ফিরে নিজেদের সম্পদ জনগণের বিশেষ করে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে ব্যয় করেছেন উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, প্রতিবন্ধীসহ অনগ্রসর-অবহেলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমানে সাড়ে ৭ লাখ অসচ্ছল প্রতিবন্ধীকে মাথাপিছু মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৫শ ৪০ কোটি টাকা। আমাদের সরকার বিসিএসসহ প্রথম শ্রেণীর চাকরিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ১ শতাংশ এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির চাকরিতে ১০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের থেরাপি, সহায়ক উপকরণ, শ্রবণ পরীক্ষা, কাউন্সেলিং ও রেফারেলসহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। **প্রতিবেদন : আফরোজা হোসেন**

জেন্ডার ও নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ

জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরন্তন কাজ করে যাচ্ছে। কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে বদ্ধপরিকর বর্তমান সরকার।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষানীতি ২০১০-এ নারী অগ্রগতি ও অধিকার রক্ষায় অনেকগুলো বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন– শিক্ষায় সকল স্তরে নারী শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য বিশেষ তহবিল গঠন এবং বেসরকারি উদ্যোগ ও অর্থায়নকে উৎসাহিত করা, ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঝরে পড়া ছাত্রীদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। অধিকসংখ্যক মেয়েকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনা এবং তাদের প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা এবং পেশাদারি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে পাঠ্যসূচিতে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের বিষয় তুলে ধরা হবে, যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে আরো অধিক সংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীদের রচনা অন্তর্ভুক্ত করা। মেয়েশিশুদের মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায় তারা যাতে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া। মেয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ে কোনোভাবে উত্ত্যক্ত না হয় তা নিশ্চিত করা, স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তোলা এবং ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা করা নিচের শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষকদের প্রাধান্য দেওয়া।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) বিধৃত প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা এবং তা অর্জনের টার্গেট সমূহ নিম্নরূপ:

শিক্ষা প্রদানের গুণগত মানের উন্নতি, শিশু শিক্ষা কার্যক্রম সারা দেশে এক ছাদের নিচে আনা, সকল বিদ্যালয়ে মানসম্মত বই সরবরাহ করা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মান উন্নত করা, শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার অসমতা

দূরীকরণ, শতভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এর অধিকাংশ কার্যক্রমে নারী উন্নয়নের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগসহ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিশুর ভর্তি ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে সমাপনী পরীক্ষায় ক্ষেত্রে নারী অর্থাৎ মেয়ে-শিশুরা ইতোমধ্যে পুরুষের চেয়ে সফলতা লাভ করেছে। তবে নারী উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয়ের বর্তমান কিছু কার্যক্রম নারীবান্ধব করা যেতে পারে। একই সাথে কিছু নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এ উভয় ক্ষেত্রেই জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও শিক্ষানীতি ২০১৪ –এর নির্দেশাবলি মানদণ্ড হিসেবে কাজ করবে। **প্রতিবেদন : সুফিয়া বেগম**

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্ব এইডস দিবস পালিত

২০৩০ সালের মধ্যে এইডসমুক্ত হবে বাংলাদেশ

প্রতিবারের মতো এ বছরও নানা কর্মসূচি পালনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য, 'আসুন ঐক্যের হাত তুলি : এইচআইভি প্রতিরোধ করি'।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ১ ডিসেম্বর ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন –পিআইডি

দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী আলাদা বাণী দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তাঁর বাণীতে এইচআইভি নির্মূলে সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি দেশের তরুণ সমাজসহ অন্য সংস্থাগুলোর কার্যকরী ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এইচআইভি আক্রান্তদের চিকিৎসায় সামাজিক বৈষম্যহীনতা সুনিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি অন্য সংস্থাগুলো এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজস্ব প্রেক্ষাপট থেকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

অন্যদিকে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, এইডসের মতো রোগ বাংলাদেশে থাকতে পারে না। যেভাবেই হোক ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে এইডসমুক্ত করা হবে। এজন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে। রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন তিনি।

উল্লেখ্য, এইডসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৮৮ সাল থেকে বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশে এইচআইভি-এইডস নিয়ন্ত্রণে ১৯৮৯ সাল থেকে প্রতিরোধ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। **প্রতিবেদন: আমজাদ হোসেন**

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বেঙ্গল উচ্চাঙ্গসংগীত উৎসব ২০১৬

রাতভর শুদ্ধসংগীতে ডুবে থাকার মতো যে উৎসব তা হলো বেঙ্গল উচ্চাঙ্গসংগীত। ২০১২ সাল থেকে রাজধানীর বনানী আর্মি স্টেডিয়ামে হাজির হন হাজারো সংগীত প্রেমি। প্রতিবারের মতো একঝাঁক শিল্পী

পাঁচ রাত শোনান তাদের যন্ত্র ও কণ্ঠসংগীত। ছিল চোখ ধাঁধানো, মত ভরানো মণিপুরি, ভরতনাট্যম, কত্থক ও ওডিশি নাচের পরিবেশনা। প্রথমবারের মতো এ দেশে সংগীত পরিবেশন করেন প্রায় ১৭ জন বিদেশি শিল্পী। এছাড়া বাংলাদেশের ১৬৫ জন শিল্পী এ উৎসবে সংগীত পরিবেশন করেন। বেঙ্গল উচ্চাঙ্গসংগীত উৎসব ২০১৬-এ শেষ রাতের প্রথম পরিবেশনা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। সবশেষে ছিল বেঙ্গল পরম্পরা সংগীতালয়ের শিক্ষার্থীদের সেতার পরিবেশনা। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন স্যার ফজলে হাসান আবেদ। এ উৎসব ২৪ নভেম্বর শুরু হয়ে চলে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত।

শিল্পকলায় ঠাকুরবাড়ির গল্প

সাংস্কৃতিক সংগঠন রক্তকরবী ও ইন্দিরা যৌথভাবে ২২ নভেম্বর জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা ভবন মিলনায়তনে 'ঠাকুরবাড়ির গান ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন দুই বাংলার শিল্পীরা। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে অতিথি ছিলেন কবি গুরুর মেজো ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে সুরেন্দনাথ ঠাকুরের বড়ো ছেলের মেয়ে সুপর্ণা ঠাকুর।

এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৫৪টি দেশের অংশগ্রহণে শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালায় ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয় 'দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী'। মাসব্যাপী এ প্রদর্শনী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর বিশিষ্ট শিল্পীদের অংশগ্রহণে এই অনন্য প্রদর্শনী ১৯৮১ সালে যাত্রা শুরু করে। এবারের প্রদর্শনীতে ৩২৯জন দেশি-বিদেশি শিল্পীর ৪৮৫টি শিল্পকর্ম স্থান পায়। অংশগ্রহণকারী দেশগুলো থেকে শিল্পী, শিল্পসমালোচক, মিউজিয়াম কিউরেটসহ মোট ১৪৬ জন বিদেশি এ প্রদর্শনীতে অংশ নেয়।

শান্তি-সম্প্রীতির শিল্পকর্ম

জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে শুরু হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইতালীয় স্থপতি ও শিল্পী নিকোলাই স্ট্রিপলির শিল্পকর্ম প্রদর্শনী 'সউল টু সউল: এ ভয়েজ অব ডিসকভারি থ্রু দ্য থ্রেডস অব বেঙ্গলি এমব্রয়ডারি।' এ প্রদর্শনী উদবোধন করেন

প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইতালির রাষ্ট্রদূত মারিও পালমা। প্রদর্শনী চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত।

ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেল মঙ্গল শোভাযাত্রা

বাঙালির প্রাণের উৎসব পয়লা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিসংঘের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক এই সংস্থা ৩০ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্বীকৃতি কথা জানিয়েছেন। ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় শেষ হওয়া ইউনেস্কোর স্পর্শতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবিষয়ক আন্তরাষ্ট্রীয় কমিটির ১১ তম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবারের সভায় বাংলাদেশ ছাড়াও ইউক্রেন, কম্বোডিয়া, কিউবা, স্পেন, আফগানিস্তান, বেলজিয়াম ও উগান্ডায় একটি করে মোট ১০টি উৎসব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর আগে ২০১৩ সালে জামদানি শাড়ি ও ২০০৮ সালে বাউলসংগীত ইউনেস্কোয় স্পর্শাতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ডিজিটাল বাংলাদেশ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ পেল ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যাওয়ার্ড

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে 'ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৬'-এ ভূষিত করেছে এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অরগানাইজেশন। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন এসোসিও'র সভাপতি বুনরাক সারাগানান্দা। মিয়ানমারের রাজধানী ইয়াঙ্গুনে অনুষ্ঠিত '২০১৬ এসোসিও জেনারেল এসেম্বলি এন্ড আইসিটি সামিট'- এর এক জমকালো অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। আইসিটি ডিভিশনের নিরলস কর্মযজ্ঞ এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির লক্ষ্যনীয় প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রাপ্তিকে আমূল পরিবর্তনে সর্বাত্মক সহযোগিতার স্বীকৃতি হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৫ নভেম্বর ২০১৬ মিয়ানমারের রাজধানী ইয়াঙ্গুনে এসোসিও জেনারেল এসেম্বলি এন্ড 'আইসিটি সামিট-২০১৬' অনুষ্ঠানে এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশনের সভাপতি বুনরাক সারাগানান্দা বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমদ পলকের হাতে 'Digital Government Award 2016' তুলে দেন –পিআইডি

পুরস্কার গ্রহণের পর প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ কার্যক্রম যে বিশ্বব্যাপী রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে, এ পুরস্কার তারই স্বীকৃতি।

আইসিটি সমঝোতা স্মারক সই- ডব্লিউআইটিএসএ

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশকে সহায়তা দিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করেছে দ্য ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স (ডব্লিউআইটিএসএ)। ১৯ নভেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি ভবনে ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন আইটি ২০২১ সালের সম্মেলন উপলক্ষে মতবিনিময় সভায় এই সমঝোতা সই হয়েছে। আইসিটি ডিভিশনের অতিরিক্ত সচিব হারুনুর রশিদ এবং ডব্লিউআইটিএসএ'র প্রেসিডেন্ট ইভনি চিউ স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ স্মারকের মেয়াদ চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকে ২০১৯ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত হবে।

'এপিক অব পলিটিক্স' অ্যাপস ৭ মার্চের ভাষণে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সেইবই এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সম্প্রতি একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সেইবই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ওপর লিখিত 'এপিক অব পলিটিক্স' বইয়ের ই-বুকে রূপান্তর ও সেইবই অ্যাপসে প্রকাশ করা হবে এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে। নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন আইসিটি বিভাগের উপ-সচিব ড. খন্দকার আজিজুল ইসলাম, উপ-সচিব সেইবইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাবিল-উদ-দৌলাহ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, আইসিটি সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদার, অতিরিক্ত সচিব হারুনুর রশীদ, উপ-সচিব জিল্লুর রহিম শাহরিয়ার ও আরো অনেকে।

অটিস্টিক শিশুদের যোগাযোগের অ্যাপ 'লুক অ্যাট মি'

স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স বাংলাদেশ নিয়ে এল একটি নতুন অ্যাপ অটিস্টিক শিশুদের জীবনমান উন্নত করতে। স্যামসাং ও সূচনা ফাউন্ডেশন এই অ্যাপ উদ্‌বোধন করেছে। এখানে উপস্থিত ছিলেন এনএসিএএনডি-এর চেয়ারপারসন সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত আন সিয়ং ডু, স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স বাংলাদেশের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সেংওয়ান ইউন, স্যামসাং রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ওয়ানমো কুসহ স্যামসাং ও সূচনা ফাউন্ডেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। 'লুক অ্যাট মি' অ্যাপ-এর মূল লক্ষ্য অটিস্টিক শিশুদের যোগাযোগের দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করা, চারপাশের মানুষের সাথে যেন সম্পর্ক আরো গভীর হয়। এই অ্যাপটি শিশুদের সাহায্য করবে অন্যের সাথে দৃষ্টি সংযোগ করা এবং নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য। 'লুক অ্যাট মি' অ্যাপটি কোরিয়া ও কানাডায় সফলতা পাওয়ার পর বাংলাদেশে উন্মোচন করা হলো।

তারুণ্যের শক্তিতে এগোচ্ছে ই-কমার্স

দেশে বর্তমানে ই-কমার্স সাইটের সংখ্যা এক হাজার। ই-কমার্স, অনলাইন মার্কেটপ্লেস, এফ-কমার্স–সব মিলিয়ে অনলাইনকেন্দ্রিক ৫০০ কোটি টাকার বাজার দেশে গড়ে

উঠেছে। উদ্যোক্তার পাশাপাশি ক্রেতাদের সিংহভাগই তরুণ প্রজন্মের।

মুঠোফোন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে এখন অনলাইনে যে-কোনো পণ্য কিনতে পাওয়া যায়। ২০১৫ সালের তথ্য নিয়ে বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান লাইটক্যাসেল পার্টনার্সের করা গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশের ই-কমার্স খাতের আকার সব মিলিয়ে বছরে এখন ৪০০ কোটি টাকার মতো। সরকারি হিসাবে বাংলাদেশ ইন্টারনেট সংযোগের সংখ্যা বর্তমানে ৬ কোটি ২২ লাখ। আর কেইমু বাংলাদেশের গবেষণা অনুযায়ী, অনলাইনে যারা কেনাকাটা করেন, তাদের ৯০ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ৪৪ বছর। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি কেনাকাটা করেন তরুণ প্রজন্ম ২৫ থেকে ৩৪ বছর বয়সিরা।

প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড পুরস্কার পেল ব্রি

আইসিটি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উদ্ভাবনী সেবা প্রদান এবং কৃষি প্রযুক্তিকে কৃষকের কাছে সহজবোধ্য ও সহজলভ্য করার স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পুরস্কার 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬' পেয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। তিনদিনব্যাপী ডিজিটাল মেলার সমপনী দিনে রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে এক অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ব্রি'র মহাপরিচালক ড. ভাগ্য রানী বণিকের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রকাশনা ও জনসংযোগ বিভাগের প্রধান প্রযুক্তি সম্পাদক এমএ কাসেম জানান, আইসিটি ও ই-কৃষি বিস্তারে ব্রি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, সাফল্য ও উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে–রাইস নলেজ ব্যাংক মোবাইল অ্যাপস, স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট, বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের জন্য লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) স্থাপন, ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ, নিজস্ব ওয়েবমেইল, গ্রুপ মেইল, ব্রি নেটওয়ার্কস নামে নিজস্ব ফেসবুক, পার্সোনাল ডাটাবেজ, ভিডিও কনফারেন্সের জন্য স্কাইপি অ্যাকাউন্ট, ই-টেন্ডার, ই-ফাইলিং, নিজস্ব ওয়েবপোর্টালে ডিজিটাল আর্কাইভের কার্যক্রম।

সামগ্রিকভাবে এবারের মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রায় সকল মন্ত্রণালয় ও দপ্তর অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে এককভাবে ব্রি এই পুরস্কার পেয়েছে।

রপ্তানি আয়ে বাড়ছে সবজির অবদান

বহির্বিশ্বে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে বাংলাদেশের শাকসবজির চাহিদা। রপ্তানির ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯৭৫ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে

বাংলাদেশের সবজি রপ্তানি শুরু হলেও ২০০০ সালের পর থেকে বিশ্ব বাজারে ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে বাংলাদেশের সবজির চাহিদা। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য মতে, গত অর্থবছরে ৬৫০ কোটি ৪১ লাখ ২০ হাজার টাকার সবজি রপ্তানি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ওমান ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের প্রায় ৫০ দেশে বাংলাদেশের ৫০ জাতের সবজি ও ফল রপ্তানি হয়।

প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী : বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ১৯ বছর পূর্তি উদ্‌যাপিত

২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ১৯ বছর পূর্তি উদযাপিত হয়েছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ১৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালন করছে। এ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করেছেন।

২ ডিসেম্বর ২০১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ১৯ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বলেন,'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সংঘাতময় পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই আওয়ামী লীগ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্বে এটি একটি বিরল ঘটনা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির মাধ্যমে এ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের জাতিগত হানাহানি বন্ধ হয়। অনগ্রসর ও অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি ও উন্নয়নের ধারা। ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার অর্জন এই চুক্তির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির স্মারক।

প্রধানমন্ত্রী বাণীতে বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকার শান্তিচুক্তির আলোকে এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ গঠন করেছি। আমাদের সরকার এ অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো, মোবাইল নেটওয়ার্কসহ সকল খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। আমরা পাহাড়ি

জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নে রাঙামাটিতে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছি। ভূমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বোর্ডের কার্যক্রম আরো গতিশীল ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ-১৯৭৬ বাতিল করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ প্রণয়ন করেছে। আমরা এই বোর্ডের বরাদ্দ বহুগুণে বৃদ্ধি করেছি। পার্বত্য জেলাসমূহের নৈসর্গিক সৌন্দর্য সমুন্নত রাখা ও পর্যটন শিল্পের প্রসারেও আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের সময়োচিত উদ্যোগ গ্রহণের ফলে আজ পার্বত্য জেলাসমূহ কোনো পিছিয়ে পড়া জনপদ নয়। দেশের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এ অঞ্চলের জনগণ সম-অংশীদার।'

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৫ ভাষায় প্রাক-প্রাথমিকের বই এবারই প্রথম

নতুন বছরের প্রথম দিন সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হাতেও ব্রেইল বই তুলে দেবে সরকার। এছাড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা নিজেদের পাঁচটি ভাষায় লেখা প্রাক-প্রাথমিকের বই পাবে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৪ ডিসেম্বর ঢাকার মাতুয়াইলে বিনামূল্যে বিতরণের বই ছাপানো হচ্ছে এমন দুটি ছাপখানা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

এবার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের পাঁচটি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিকের বই ছাপানো হয়েছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আদিবাসী নৃগোষ্ঠীর সকল ভাষায় লিপি নেই, সাহিত্য নেই, লেখা নেই। যেটা আছে আমরা চাই সেটাতেই তারা শিখুক। মায়ের কোল থেকে নেমেই সে প্রথমে স্কুলে যায়, বাংলা ভাষায় কথা সে বুঝতে পারে না'।

চাকমা, মারমা, সাদ্রী, ত্রিপুরা ও গারো এই পাঁচ ভাষায় প্রাক-প্রাথমিকের বই পাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা।

শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ আরো বলেন, 'ঠিক সময়ে তাদের হাতে এসব বই পৌঁছে দেব। আমরা প্রাথমিক স্তরে সেই ধরনের শিক্ষকও তৈরি করতে চাই।' তিনি জানান, প্রতিবছরের মতো আগামী ১ জানুয়ারি ২০১৭ পাঠ্যপুস্তক উৎসব করে সব শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেওয়া হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষে ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার বই ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা জানান, এবার নয় হাজার ৭০৩ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ব্রেইল বই এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ২৪ হাজার শিশুর হাতে তাদের নিজেদের ভাষায় লেখা বই তুলে দেওয়া হবে।

চলতি শিক্ষাবর্ষে ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৪৭ হাজার ৯৭২টি বই বিতরণ করেছিল সরকার। সেই হিসেবে এবার ২ কোটি ৮৪ লাখ ৩৪ হাজার ২৩৭টি বই ও শিক্ষা উপকরণ বেশি বিতরণ করা হবে।

প্রতিবেদন : লিয়াকত হোসেন ভূঞা

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

স্বপ্নের পদ্মা সেতু

পদ্মা সেতুতে পিলারের পাইলিং কাজ এগিয়ে চলছে। ফলে মানুষের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। দূর দূরান্ত থেকে আগ্রহী মানুষের আগমন ঘটে পদ্মা সেতুর কাজ দেখার জন্য। ৪২টি পিলারের উপর মাওয়া থেকে জাজিরা পর্যন্ত ১৫০ মিটার দীর্ঘ ৪১টি স্প্যান দিয়ে গড়ে উঠবে পদ্মা বহুমুখী সেতু। ডিসেম্বরের মধ্যে সেতুর আকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পদ্মা সেতু কেবল দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের স্বপ্ন নয়– গোটা জাতির আকাঙ্ক্ষা। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত হচ্ছে এ সেতু যা দেশবাসীর গর্ব। এ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৩৯ শতাংশে পৌঁছেছে। এ পর্যন্ত ৩৫টি পাইল স্থাপন করা হয়েছে। সেটিতে ২৪০টি পাইল বসানো হবে। ৩ মিটার ব্যাসের ৪০০ ফুট দীর্ঘ একেকটি পাইল। সেতুর ৪০টি পিলার থাকবে নদীর ভিতরের অংশে। বাকি দুটি থাকবে দুই প্রান্তে সংযোগ সেতুতে। প্রতি পিলারে থাকবে ৬টি করে পাইল। জার্মানির শক্তিশালী হ্যামার দিয়ে স্থাপন করা হচ্ছে এসব পিলার। এক যোগে ৭টি পিলার স্থাপনের কাজ চলছে। সেই সঙ্গে কাজ করছে সারি সারি ড্রেজার।

একদিকে চলছে চিনা কোম্পানি সিলেট সিনিহাইড্রোর নদী শাসন কাজ। সারি সারি ড্রেজিং এর ব্যবস্থা। অন্যদিকে চলছে চায়না মেজর ব্রিজ কোম্পানির পাইলিং অর্থাৎ মূল সেতুর নির্মাণ কাজ। সেতুর সংযোগ সড়কের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। নির্মাণ কাজ প্রসঙ্গে সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, সিডিউল অনুযায়ী কাজ চলছে। অগ্রগতি সন্তোষজনক। ২০১৮ সালের মধ্যেই কাজ শেষ হবে। পদ্মা সেতু ও দেশের প্রথম ফোরলেন এক্সপ্রেস ওয়ে ২০১৮ সালের এই দিনে চালু হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র অনুযায়ী জানা যায়, অতি দ্রুত দুটি পিলারের উপর স্প্যান-গার্ডার বসিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। এরফলে পদ্মা সেতুর আকৃতি স্পষ্ট হবে। পদ্মার মাওয়া প্রান্তে দেখা যায় প্রকল্পের ইয়ার্ডে সেতুর স্প্যানের উপরিভাগের জয়েন্টর কাজ চলছে। চীনা এবং বাংলাদেশি শ্রমিকেরা যৌথভাবে সেতুর জয়েন্ট, সেকশন, গার্ডার, টপকর্ড ও বটসকর্ড অংশের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সেতুটির মূল অবকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে স্টিল দিয়ে। তীব্র বায়ু প্রবাহ ও ভূমিকম্পজনিত ধাক্কা মোকাবিলায় বেছে নেওয়া হয়েছে ওয়ারেন ট্রাস ফর্ম।

পদ্মা সেতু হবে দুই তলা বিশিষ্ট। ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতুর উপর দিয়ে গাড়ি চলবে আর নীচ দিয়ে চলবে ট্রেন। পিলারগুলো হবে কংক্রিটের আর মূল সেতুটি হবে স্টিল স্ট্রাকচারের। ইতোমধ্যে লুক্সেমবার্গ থেকে আনা হয়েছে রেললাইনের স্ট্রিংগার। এগুলোর ওপর কংক্রিটের স্ল্যাব দিয়ে তার ওপর বসানো হবে রেললাইন। **প্রতিবেদন : শিবপদ ম-ল**

ইতিহাস ও ঐতিহ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

ইতিহাস-ঐতিহ্যে সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরা জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। সাতক্ষীরা জেলার উত্তরে যশোর জেলা। দক্ষিণে

বঙ্গোপসাগর, পূর্বে খুলনা জেলা এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য অবস্থিত। উচ্চতার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এ অঞ্চল সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে আনুমানিক ১৬ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। সাতক্ষীরা জেলা উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। বিস্তীর্ণ এ অঞ্চলের সব অংশে জনবসতি নেই। এরমধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ বনাঞ্চল। সুন্দরবনের মধ্যে যে পরিমাণ ভূমি আছে তার পরিমাণ ১৪৪৫.১৮ বর্গ কিলোমিটার। সাতটি উপজেলা নিয়ে সাতক্ষীরা জেলা। উপজেলাগুলো হচ্ছে– আশাশুনি উপজেলা, কলারোয়া উপজেলা, কালীগঞ্জ উপজেলা, তালা উপজেলা, দেবহাটা উপজেলা, শ্যামনগর উপজেলা এবং সাতক্ষীরা সদর উপজেলা। জেলার মোট আয়তন ৩৮৫৮.৩৩ কি.মি. (১৪৮৯.৭১ বর্গ মাইল)।

প্রাচীনকলে এই জেলাকে বাগড়ী, ব্যাঘতট, সমতট, যশোর চূড়ন প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। জেলা নামকরণের বিষয়ে জানা যায়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এক কর্মচারী বিষুরাম চক্রবর্তী নিলামে চূড়ন পরগণা ক্রয় করে তার অন্তর্গত সাতঘরিয়া নামক গ্রামে বাড়ি নির্মাণ করেন। তার পুত্র প্রাণনাথ সাতঘরিয়া অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন করেন। ১৮৬১ সালে মহকুমা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর ইংরেজ শাসকেরা তাদের পরিচিত সাতঘরিয়াতেই প্রধান কার্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। ইতোমধ্যেই উচ্চারণ গত কারণে সাতঘরিয়া ইংরেজ কর্মচারীদের মুখে 'সাতক্ষীরা' হয়ে যায়। তবে রূপকথার কাহিনির মতো প্রচলিত আছে যে, প্রাচীনকালে সাত মনীষী সাগর ভ্রমণে এসে একান্ত শখের বসে ক্ষীর রান্না করে খেয়েছিলেন। পরবর্তীতে 'ক্ষীর' এর সাথে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ক্ষীরা হয় এবং লোকমুখে উচ্চারণে সুবিধার জন্য সাতক্ষীর প্রচলিত হয়ে যায় 'সাতক্ষীরা'।

১৮৬১ সালে যশোর জেলার অধীনে সাতটি থানা নিয়ে সাতক্ষীরা মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৮৬৩ সালে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার অধীনে এই মহকুমার কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৮৮২ সালে খুলনা জেলা প্রতিষ্ঠিত হলে সাতক্ষীরা খুলনা জেলা অন্তর্ভুক্ত একটি মহকুমা হিসেবে স্থান লাভ করে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে ১৯৮৪ সালে সাতক্ষীরা মহকুমা জেলায় উন্নীত হয়।

সাতক্ষীরার দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ মৎস্য চাষের উপর নির্ভরশীল। চিংড়ি চাষে সাতক্ষীরা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, নারকেল, লিচু, সফেদা, জামরুল, কদবেল, পেয়ারা ও বরই সাতক্ষীরায় প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। সাতক্ষীরার উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে– চিংড়ি, ধান, পাট, গম, পানপাতা এবং চামড়া। সাতক্ষীরা থেকে নিয়মিত যে সমস্ত পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয় তারমধ্যে দৈনিক সাতক্ষীরা নিউজ (বাংলা ও ইংরেজি) দৈনিক দৃষ্টিপাত, দৈনিক পত্রদূত, দৈনিক সাতক্ষীরা চিত্র উল্লেখযোগ্য।

চিত্তাকর্ষক ও দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে শ্যামনগরের মান্দার বাড়ি সমুদ্র সৈকত। শ্যাম নগরে জমিদার বাড়ি ও যশোরেশ্বরী মন্দির, কালীগঞ্জে নলতা রওজা শরীফ, দেবহাটার নীলকুঠি। কলারোয়ায় বৌদ্ধমঠ, কালিগঞ্জে বনলতা বাগান ও মিনিপিকনিক স্পট এবং আব্বাস গার্ডেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সমাজসেবক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সংস্কারক। খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ। লেখকও কবি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক সিকান্দার আবু জাফর, বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান। বিশিষ্ট সাহিত্যিক আনিস সিদ্দিকী সাংবাদিক তোয়াব খান, সাংবাদিক ও টি,ভি ব্যক্তিত্ব আবেদ খান। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেত্রী রানী সরকার। প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন, বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী নীলুফার ইয়াসমিন, নাট্যশিল্পী তারিক আনাম খান, নাট্যশিল্পী আফজাল হোসেন, নাট্যশিল্পী ফাল্গুনী হামিদ ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমান, ক্রিকেটার সৌম্য সরকার প্রমুখ। **প্রতিবেদন : অনিন্দিতা**

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতিসংঘ শীর্ষ জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২২)

বিগত ৭ নভেম্বর শুরু হয় জাতিসংঘ শীর্ষ জলবায়ু সম্মেলন (কপ–২২)। সম্মেলনটি ১২ দিনব্যাপী স্থায়ী হয়। ১৮ নভেম্বর মারাকাস ঘোষণার মধ্যদিয়েই শেষ হয় জাতিসংঘের ২২তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন। সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ৫৪টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ। ১২০টি দেশের মন্ত্রী বা মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিও এতে যোগ দিয়েছিলেন। এতে যোগ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্যারিস চুক্তির আলোকে বৈশ্বিক জলবায়ু কার্যক্রমকে দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকারের মধ্যদিয়ে শেষ হয় জলবায়ু সম্মেলন কপ-২২। এক পৃষ্ঠার মারাকাস ঘোষণায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলাকে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছে রাষ্ট্রগুলো। সে জন্য প্যারিস জলবায়ু চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে একমত হয়েছে ১৯৩টি রাষ্ট্র। সম্মেলনের আয়োজক সংস্থা জাতিসংঘ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ নভেম্বর ২০১৬ মরক্কোর মারাকাসে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনফারেন্সের High Level Segment of COP 22 -এর উদ্‌বোধন পর্বে ভেন্যুর প্লেনারি হলে পৌঁছালে তাঁকে স্বাগত জানানো হয় –পিআইডি

জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (ইউএনএফসিসিসি) ওয়েবসাইটে ওই ঘোষণা প্রকাশ করে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) পূরণকে ওই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে গুরুত্ব পেয়েছে স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলোর দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন। দিনে দিনে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে যার প্রভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন এবং এর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি সারাবিশ্বে বহুল আলোচিত বিষয়। একে পৃথিবীর নিরাপত্তার প্রতি গুরুতর হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে। উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নামে দেশে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিমিত ও যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিকারী গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমনও বেড়ে গেছে। এ দুটো কারণে আজকের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ২১তম জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন হয়। সম্মেলনে কনভেনশনের সদস্য দেশগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি জলবায়ু চুক্তি করে, যা 'ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি' নামে পরিচিত। সেই প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন কীভাবে হচ্ছে তা এই সম্মেলনে উঠে আসে। সম্মেলনে এবার উঠে এসেছে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যথা– কার্বন নিঃসরণ শূন্য পর্যায়ে নিয়ে আসা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে সম্মত হওয়া, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সমুদ্রের পানির ক্রমবর্ধমান উচ্চতা ইত্যাদি। মারাকাস জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশের ছিল শক্ত অবস্থান। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট খরা, বন্যা ও ঝড়-বৃষ্টির কারণে বাস্তুচ্যুত জনগণের ক্ষতি ও সমস্যার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে যারা বাস্তুচ্যুত হবে, তাদের সমস্যার সমাধান ছাড়া টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা যাবে না। শেখ হাসিনা আরো বলেন, পানির ব্যবহার বিষয়ে নতুন একটি বিশ্ব তহবিল গড়ে তুলতে হবে। এই তহবিল দিয়ে পানির ওপর গবেষণা, নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও সেগুলো বাস্তবায়নে সম্ভাব্য কৌশল হস্তান্তর ছাড়া বিশ্বের পানি ব্যবস্থাপনা সঠিক ও প্রয়োজন অনুযায়ী করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে পানি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ওই সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলায় একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করা হয়েছিল। এখন ওই পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার সময় ওই সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করার সময়।

বিশ্বকে আরো নিরাপদ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরো নিশ্চিন্ত স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে আমাদের সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর জোরালো দাবি বিশ্ব নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। যার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য পানি ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের কথাও ঠাঁই পেয়েছে নতুন ঘোষণায়। ১৬৫ দেশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ২০২০ সাল নাগাদ তাদের কার্বন নির্গমন ৮০ শতাংশ হ্রাস করবে। ২০৫০ সালের মধ্যে তারা কার্বন নির্গমন কমাতে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানির লক্ষ্য অর্জন করবে। শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে জন্ম নেবে স্বল্প কার্বন নির্গমনের এক নতুন পৃথিবী। **প্রতিবেদন : জান্নাত হোসেন**

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় আয়নাবাজি

বাংলাদেশের পর এবার কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় মুক্তি পায় অমিতাভ রেজা চৌধুরীর আয়নাবাজি। ১৮ নভেম্বর থেকে কানাডার টরেন্টো, ক্যালগারি ও ইউনিপেগ শহরে দুই সপ্তাহ চলে ছবিটি। এরপর ভ্যাংকুভার ও মন্ট্রিলেও মুক্তি পেয়েছে আয়নাবাজি। কানাডার পর ছবিটি মুক্তি পায় অস্ট্রেলিয়ায়। ২৬ ও ২৭ নভেম্বর এবং ৩ ও ৪ ডিসেম্বর সিডনির রিডিং সিনেমাজে ছবিটি দেখানো হয়।

টোকিও ফেস্টিভ্যালে নাসিমা

জাপানে অনুষ্ঠিতব্য মর্যাদাপূর্ণ প্রামাণ্যচিত্র উৎসব 'টোকিও ডকস'–এ বাংলাদেশের প্রথম নারী সার্ফার নাসিমার সার্ফিং জীবন এবং কক্সবাজারের সার্ফিং নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এ প্রামাণ্যচিত্রটি যৌথভাবে পরিচালনা করেছেন গুপী–বাঘা প্রোডাকশন্স লিমিটেডের কর্ণধার আরিফুর রহমান ও বিজন ইমতিয়াজ। এ জুটির প্রথম ফিচার ফিল্ম 'মাটির প্রজার দেশে' চলতি বছরে শিকাগো সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। ছবিটি ২০১৫ সালের 'টোকিও ডকস'– এর

পঞ্চম আসরে চারটি গল্প অর্থ পুরস্কার পাওয়ার গৌরব অর্জন করে। ৬ নভেম্বর জাপানের টোকিও শহরে 'টোকিও ডকস'– এর ৬ষ্ঠ আসরে প্রথমবারের মতো প্রদর্শিত হয় নাসিমা প্রামাণ্যচিত্রটি। প্রামাণ্যচিত্রের গল্পে দেখানো হয়েছে– বাংলাদেশে খেলা হিসেবে সার্ফিং একেবারেই নতুন। তাই বিদেশি পর্যটকদের সার্ফিং দেখে দেখে কক্সবাজারের ঢেউয়ে প্রথমবারের মতো সার্ফিং শুরু করেন জাফর আলম। তাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে এ খেলায় যুক্ত হোন নাসিমা। এরপর টানা চারবার ছেলেমেয়ে উভয়ের মধ্যেই জাতীয় সার্ফিং– এ চ্যাম্পিয়ন হোন তিনি। যখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে নিজের নাম ছড়িয়ে পড়ে সারাবিশ্বে, তখনই সার্ফিং ছেড়ে দিতে বাধ্য হোন তিনি। একটা সময় সার্ফিং ছাড়া জীবন অর্থহীন মনে হতে শুরু করে নাসিমার। শুরু হয় আবারো সার্ফিংয়ে ফেরার লড়াই। দুই বছর পর ফের প্রতিযোগিতায় নাম লেখান নাসিমা। শুরু হয় নতুন এক যুদ্ধ। নাসিমার সেই জীবনযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করেই এগিয়ে যায় প্রামাণ্যচিত্রটির গল্প। টোকিও ডকসে দেখানো হয় ছবিটির ৩০ মিনিটের একটি সংস্করণ। এছাড়া বিশ্বের অন্যান্য ফেস্টিভ্যালের জন্য এর একটি ফিচার ভার্সন তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সিনেমা হলে এটি দেখানো হবে।

সিঙ্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 'লাইভ ফ্রম ঢাকা'

তরুণ নির্মাতা আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদের প্রথম ছবি 'লাইভ ফ্রম ঢাকা' সিঙ্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হয়। এই উৎসব ২৩ নভেম্বর শুরু হয়ে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে। ২৭তম এই আসরে বাংলাদেশ থেকে এশিয়ান ফিচার ফিল্ম কম্পিটিশন ক্যাটাগরিতে সিলভার স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডের জন্য লড়াই করে ছবিটি। এই ছবিটি দিয়ে উৎসবের উদ্‌বোধনীর প্রদর্শনী হয়। ২ ও ৩ ডিসেম্বর প্রদর্শিত হয় ছবিটি। ৯৪ মিনিটের এই ছবিটি সাদাকালো। এ

ছবিতে অভিনয় করেন– মোস্তফা মনোয়ার ও তাসনোভা তামান্না। ছবিটির একটি ট্রেলার ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছে। এ ছবিটির কাহিনিতে দেখানো হবে– একজন মানুষ যে নাকি অনেক বছর ধরে ঢাকায় থাকে। ঢাকা যার কাছে কখনো অসহ্য, আবার এই ঢাকা কখনো তার প্রিয় শহর। এ রকম জায়গা থেকে ছবিটি নির্মাণ করা হয়। **প্রতিবেদন : মিতা খান**

সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র প্রণয়ন

জিইডি সূত্রে জানা গেছে, দেশের দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাস এবং জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে ২০১৫ সালে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন করে সরকার। এ কৌশলের মাধ্যমে সকল যোগ্য বাংলাদেশির জন্য এমন একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে, যা দারিদ্র্য ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করবে। এছাড়া বৃহত্তর মানব উন্নয়ন কর্মের সুযোগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এতে জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৪৫ হাজার ২৩০ কোটি টাকা। এ বরাদ্দ মোট বাজেটের ১৩ দশমিক ২৮ শতাংশ এবং জিডিপির ২ দশমিক ৩১ শতাংশ। বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বর্তমানে ১৪২টি কর্মসূচি রয়েছে। ২৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করছে।

সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে কৌশলপত্র তৈরি করা হয়েছে। ওই কৌশলপত্র বিবেচনায় নিয়ে এ নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে। এতে বয়স্ক, বিধবা, দুস্থ মহিলা, দুগ্ধ দানকারী দরিদ্র মা, অসচ্ছল, প্রতিবন্ধী, মুক্তিযোদ্ধা, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী এ সুবিধা ভোগ করবেন। একই সঙ্গে ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকজনিত প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীরা এ সুবিধা পাবেন।

ইতোমধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উপকার ভোগীর ও ভাতা নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একই সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনাও তৈরি হচ্ছে। এরই মধ্যে ২৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ তাদের প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলো হলো– বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৩১ লাখ ৫০ হাজার জন এবং ভাতার হার ১০০ টাকা বৃদ্ধি করে ৫০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা, দুস্থ মহিলা ভাতার হার ১০০ টাকা বৃদ্ধি করে ৫০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে ১১ লাখ ৫০ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে। ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) কর্মসূচির উপকারভোগী দুস্থ মহিলার সংখ্যা দুই লাখ ৫০ হাজার বাড়িয়ে ১০ লাখে উন্নীত করা হচ্ছে। মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীর সংখ্যা প্রায় ৯০ শতাংশ বাড়িয়ে পাঁচ লাখে উন্নীত করা হবে। দেশের সকল পৌরসভায় কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার (দুগ্ধদানকারী মা) সহায়তা কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে এক লাখ ৮০ হাজার ৩০০ জন দরিদ্র মাকে ভাতার আওতায় আনা হবে। এছাড়া অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতার হার ১০০ টাকা বাড়িয়ে ৬০০ টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে সাত লাখ ৫০ হাজার জনে উন্নীত করা হবে। আর নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের তহবিলে আরো ১০ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হবে।

এছাড়া মুক্তিযোদ্ধা ভাতা আট হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা। হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের অধীনে বিশেষ ভাতা ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ৬০০ টাকা। বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ভাতা ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা, চা শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ ১০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ কোটি টাকায় উন্নীত করা হবে। এছাড়া ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকজনিত প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বরাদ্দ ২০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হবে। **প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন**

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

সড়কের পাশে জলাধার রাখতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে ১০ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নতুন করে মহাসড়ক নির্মাণ করার সময় সড়কের পাশে জলাধার তৈরি করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। একনেক সভায় অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে– ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙা-মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়ক উন্নীতকরণ (প্রথম সংশোধিত) প্রকল্প। এই প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৬.৭৫ কোটি টাকা। এর পুরোটাই জিওবি। জামালপুর-মাদারগঞ্জ মহাসড়কে ৩টি পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। এ প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৭০.০৯ কোটি টাকা। এর পুরোটাই জিওবি।

সীমান্তে ৮০০ কি. মি. সড়ক নির্মাণ করবে সেনাবাহিনী

কুমিল্লা সেনানিবাসের এম আর চৌধুরী গ্রাউন্ডে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, পৃথিবীর সব দেশে বর্ডারে সড়ক থাকলেও বাংলাদেশে নেই। সেনাবাহিনী আগামী বছর থেকে প্রায় ৮০০ কি.মি. সীমান্ত সড়কের কাজ শুরু করবে। যার নকশা চূড়ান্ত করা আছে। তিনি আরো বলেন, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পার্টনার সেনাবাহিনী। সড়ক যোগাযোগে যে বিপ্লব ঘটছে তাতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য মন্ত্রণালয়েও তারা ভূমিকা পালন করে আসছে।

৭ ঘণ্টায় এক কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ হবে

সড়কের পুরনো পিচ ও ইটপাথর কেটে নতুন করে তা সংস্কার করতে দুটি আধুনিক যন্ত্র আমদানি করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। এরমধ্যে একটি যন্ত্র দিয়ে ১২ ফুট প্রস্থের এক কিলোমিটার সড়ক কাটতে সময় লাগবে এক ঘণ্টা। আর তা কাটার পর বেরিয়ে আসা ইটপাথর পুর্নপ্রক্রিয়া করা যাবে আরেকটি যন্ত্র

দিয়ে। এই যন্ত্র প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আনা হয়েছে। এ-সব যন্ত্রসহ অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে এক কিলোমিটার সড়ক সংস্কার করতে সময় লাগবে সাত ঘন্টা। এই যন্ত্র দুটির নাম হলো– 'কোল্ড মিলিং মেশিন ও কোল্ড রি-সাইক্লিং প্ল্যান্ট'। যন্ত্র দুটি ইতালি ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আমদানি করা হয়েছে। এতে একটি সড়ক নির্মাণে প্রতি কিলোমিটারে প্রায় ৪৫ ভাগ খরচ কমে যাবে।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত

২২ অক্টোবর ২০১৬ পালিত হয় জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস। এ উপলক্ষে মাসব্যাপী ব্যাপক আয়োজন করা হয়। 'নিরাপদ সড়ক চাই' সংগঠনের পক্ষ থেকে সারাদেশব্যাপী একযোগে র‍্যালি, সমাবেশ ও আলোচনা সভার মধ্যদিয়ে পালিত হয় এ দিবসটি। নিসচাঁর উদ্যোগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গাড়ি চালকদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বাল্যবিবাহ বন্ধে 'লাল কার্ড' প্রচারণা

বাল্যবিবাহ বন্ধে 'লাল কার্ড' প্রদর্শন করে অভিনব প্রচারণা শুরু করেছে টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলা প্রশাসন। স্কাউট উপজেলা শাখার সহযোগিতায় গোপালপুর উপজেলায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ উপলক্ষে সম্প্রতি নন্দনপুর রাধারানী পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের সম্মুখে 'শিক্ষিত মেয়ে দেশের সম্পদ' স্লোগানে গোপালপুর- টাঙ্গাইল সড়কে আধঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন শেষে যানবাহনে বাল্যবিবাহ বিরোধী লাল স্টিকার সংযোজন কর্মসূচি শুরু হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে পৌর মেয়র, সহকারী কমিশনার, কৃষি অফিসার, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা পল্লি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ধোপাকান্দি এবং কয়েকটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা বিআরডিবি'র চেয়ারম্যান, বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ছাত্র-শিক্ষকসহ

সব শ্রেণির মানুষ মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন।

পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্কাউট সদস্যদের নিয়ে উপজেলার ১০টি 'বাল্যবিবাহকে লাল কার্ড' লেখা স্টিকার গোপালপুর উপজেলা হয়ে যাতায়াতকারী সব সিএনজি, ইজিবাইক, অটোরিকশা, বাস, ট্রাক, মাইক্রোবাস ও রিকশা-ভ্যানে সংযোজন করেন। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে গোপালপুর উপজেলায় বাল্যবিবাহ শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনাসহ যৌতুক ও ইভটিজিং বন্ধে কাজ করছে উপজেলা প্রশাসন।

বাল্যবিবাহমুক্ত সিলেট জেলা

সিলেট জেলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাল্যবিবাহমুক্ত ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। নগরের আরামবাগ এলাকার আমানউল্লাহ কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এ সময় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়, 'বাল্যবিবাহ' যারাই পড়াবেন, তাদের কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

'কন্যাশিশুর বিয়ে নয়, করবে তারা বিশ্ব জয়' স্লোগান নিয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সিলেটের জেলা প্রশাসনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব। অনুষ্ঠানে নানা শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জেলার ১৩টি উপজেলার ১০৫টি ইউনিয়নের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, জনপ্রতিনিধি, বিবাহ নিবন্ধক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতাদের উপস্থিতিতে নানা ধরনের সচেতনতামূলক সমাবেশ হয়েছে। **প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ**

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

সবুজ পোশাক শিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সবুজ পোশাক শিল্পে বাংলাদেশ এখন শীর্ষে উঠে এসেছে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, আয়ারল্যান্ড ও ভিয়েতনামকে পেছনে ফেলে। এ শিল্পে বাংলাদেশ বিশ্বে এখন প্রথম। তাছাড়া বিশ্বের শীর্ষ ১০টি পরিবেশবান্ধব তৈরি পোশাক পণ্য উৎপাদনকারী কারখানাসমূহের মধ্যে ৫টিই বাংলাদেশের।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলে (ইউএসজিবিসি) নিবন্ধিত ১৯৫টি বাংলাদেশি সবুজ পোশাক কারখানার মধ্যে ৩৬টি লিড সনদ পেয়েছে। তার মধ্যে ৯৭ পয়েন্ট পেয়ে বিশ্বের নাম্বার ওয়ান পোশাক কারখানার স্বীকৃতি অর্জন করেছে রেমি হোল্ডিংস লিমিটেড। তাছাড়া ইউএসজিবিসিতে নিবন্ধিত আরো ১৫৯টি বাংলাদেশি সবুজ পোশাক কারখানা লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডিজাইন (লিড) সনদ পাওয়ার অপেক্ষায় আছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সম্প্রতি প্রকাশিত 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিসংখ্যান–২০১৫' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পরই বাংলাদেশের স্থান।

জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত হচ্ছে 'ইলিশ'

বাংলাদেশের জাতীয় মাছ 'ইলিশ' ভৌগোলিক নির্দেশক (জিওগ্রাফিক্যাল ইনডিকেশন–জিআই) পণ্য হিসেবে নিবন্ধন পেতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে গত ১৩ নভেম্বর ২০১৬, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. সৈয়দ আরিফ আজাদ আনুষ্ঠানিকভাবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়ার নিকট আবেদনপত্র জমা দেন। আবেদনপত্র গ্রহণ করে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার জিআই পণ্যসহ মেধাসম্পদের মালিকানা সুরক্ষায় ব্যাপক

উদ্যোগ নিয়েছে এবং কার্যক্রম অব্যাহত। জিআই পণ্যের মালিকানা সত্ত্ব ও নিবন্ধনের লক্ষ্যে বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার (ডাব্লিউআইপিও) সহায়তায় ইতোমধ্যে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

তৈরি পোশাকে রপ্তানি বেড়েছে ৭.০৮%

সম্প্রতি নভেম্বর ২০১৬-তে প্রকাশিত বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম ৪ মাসে অর্থাৎ জুলাই–অক্টোবর মেয়াদে তৈরি পোশাক খাতের পণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছে ৮৮২ কোটি ১৪ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার; যা এ সময়ের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৭ দশমিক ২৫ শতাংশ কম। তবে গত অর্থবছরের প্রথম ৪ মাসের তুলনায় এবার এ খাতের পণ্য রপ্তানি আয় ৭ দশমিক ০৮ শতাংশ বেড়েছে।

ইপিবির প্রতিবেদনে আরো জানানো হয়েছে, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম ৪ মাসে নিটওয়্যার পণ্য রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৪৩ কোটি ৬০ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। আলোচ্য সময়ের মধ্যে এই খাতে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে ৪৫৩ কোটি ৫১ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার; যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২ দশমিক ২৩ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় আলোচ্য খাতের রপ্তানি আয় ৮ দশমিক ৭৫ শতাংশ বেড়েছে।

প্রতিবেদনে আরো জানানো হয়েছে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আলোচ্য খাতে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ৬২১ কোটি মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর মেয়াদে ওভেন গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫০৭ কোটি ৫০ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার। এই সময়ের মধ্যে এই খাতে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে ৪২৮ কোটি ৬৩ লাখ মার্কিন ডলার; যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ কম। তবে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় আলোচ্য খাতের রপ্তানি আয় ৫ দশমিক ৩৭ শতাংশ বেড়েছে। **প্রতিবেদন : প্রসেনজিৎ কুমার দে**

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

বুদাপেস্টে পানি শীর্ষ সম্মেলন ২০১৬–এ প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে ২ দিনব্যাপী 'পানি শীর্ষ সম্মেলন ২০১৬' অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ নভেম্বর চার দিনের সরকারি সফরে হাঙ্গেরি পৌঁছেন। হাঙ্গেরির বুদাপেস্টের ফিরেন্স লিজট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলে সিকিউরিটি পলিসি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইস্টভ এন মিকোলা, বাংলাদেশে নিযুক্ত হাঙ্গেরির রাষ্ট্রদূত গাইউলা পেথো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভ্যর্থনা জানান। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রধানমন্ত্রীকে মোটর শোভাযাত্রা সহকারে ফোর সিজন্স হোটেল গ্রিসহাম প্যালেস-এ নিয়ে যাওয়া হয়। সফরকালে তিনি সেই হোটেলেই অবস্থান করেন। ২৮ নভেম্বর হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে মিলেনারিস পার্কে আন্তর্জাতিক পানি সম্মেলনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট জনোস এডার। সম্মেলনে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পানিকে সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং পরিবেশের ভারসাম্যের মূলভিত্তি হিসেবে বর্ণনা করেন এবং এই সম্মেলনের আয়োজন করায় হাঙ্গেরি সরকারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি পানি ব্যবস্থাপনায় সার্বজনীন বৈশ্বিক উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং দুষ্প্রাপ্য উৎস অন্তর্ভুক্ত করে সাত দফা এজেন্ডা উত্থাপন করে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে তাঁদের দেশের পলিসিতে পানি সম্পর্কিত বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পানি ব্যবস্থাপনায় এখনই কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার ভূমিকা পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী আন্তঃসীমান্ত পানি বণ্টনে যথাযথ নীতিমালা প্রণয়নের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন এবং সুব্যবস্থাপনা খুবই প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেন। তাই পানি ইস্যুকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের দর্শন, সংস্কৃতি, জীবন ও জীবিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে পানি। তিনি নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ক্ষেত্রে এমডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য তুলে ধরে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ নভেম্বর ২০১৬ হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে Water Summit -এর উদ্‌বোধন পর্বে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

বাংলাদেশ বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলায় ধারাবাহিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। যা ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছে। সম্মেলন শেষে ২৯ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন এবং প্রেসিডেন্টের দেওয়া নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন। বুদাপেস্টের সিটি পার্কে হিরোস স্কয়ারে হাঙ্গেরি প্রতিষ্ঠায় জাতীয় বীর ও নিহত সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একই দিন বাংলাদেশ–হাঙ্গেরিয়ান বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক ফোরামের উদ্‌বোধন করেন। তিনি নাগরিক সংবর্ধনায় অংশগ্রহণ করেন এবং দেশের ভাবমূর্তি অধিকতর উজ্জ্বল করতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে 'সাসটেইনেবল ওয়াটার সলিউশন এক্সপো' পরিদর্শন করেন। এছাড়া সম্মেলনে দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে আলোচনা, পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সহযোগী ও কৃষি বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় এবং এফবিসিসিআই ও হাঙ্গেরিয়ান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির মধ্যেও একটি এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়। সম্মেলন শেষে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে ৩০ নভেম্বর দেশে ফেরেন।

প্রতিবেদন : সাবিনা ইয়াসমিন

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

এএইচএফ কাপ হকিতে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত এএইচএফ কাপ হকিতে বাংলাদেশ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে আগামী বছর–২০১৭ সালে এশিয়া কাপ হকির চূড়ান্ত পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে হাসান, জুয়েল, নিলয়, দ্বিতীয়ার্ধে আশরাফুল ও কামরুজ্জামান রানা গোল করে দলকে বড়ো ব্যবধানে বিজয়ী করেন। দুই গ্রুপে আট দেশের চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে বাংলাদেশ দল খেলে হংকং, সিঙ্গাপুর ও শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

এএইচএফ কাপ হকিতে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

বিপিএল চতুর্থ আসরে চ্যাম্পিয়ন ঢাকা ডাইনামাইট্‌স

বিপিএল চতুর্থ আসরে চ্যাম্পিয়ন ঢাকা ডাইনামাইট্‌স

অনেক জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিপিএল চতুর্থ আসরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ঢাকা ডাইনামাইট্‌স। সিরিজ সেরা হয়েছেন খুলনা টাইটানসের মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। শেষ পর্যন্ত ফাইনালে রাজশাহী, ঢাকার প্রতিপক্ষ হয়ে খেলেছে। তৃতীয় স্থান থেকে গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে এলিমিনেট রাউন্ডে উঠে আসে রাজশাহী কিংস। ৯ ডিসেম্বর প্রথম কোয়ালিফায়ার বিজয়ী ঢাকা ডায়ানামাইটস ও রাজশাহী কিংসের মধ্যে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

আগস্টেই বাংলাদেশ সফর অস্ট্রেলিয়ার

অনেক জল্পনা-কল্পনার পর আগামী আগস্ট ২০১৭ দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজ খেলতে আসার মত ব্যক্ত করেছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল।

১১ ডিসেম্বর শুরু হতে যাচ্ছে বিজয় দিবস রাগবি

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী মার্সেল–বিজয় দিবস রাগবি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। যার আয়োজক বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশন। প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা বিভাগে মোট ৮টি দল অংশ নেয়। ১২ তারিখ সোমবার ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হবে এই প্রতিযোগিতার।

মোহাম্মদ শহীদের পর এবার ইনজুরিতে সিটকে পড়লেন শফিউল

নিউজিল্যান্ড সফর অনিশ্চিত হয়ে গেল মোহাম্মদ শহীদ এবং ফাস্ট বোলার শফিউলের। বিপিএলে ঢাকা ডায়ানামাইটসের হয়ে দারুণ খেলছিলেন মো. শহীদ এবং খুলনা টাইটান্সের হয়ে শফিউল। দুইজনই বিপিএল খেলে দর্শকদের নজর কেড়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবসত আসন্ন ২২ ডিসেম্বর জাতীয় ক্রিকেট দলের নিউজিল্যান্ড সফর থেকে ইনজুরির কারণে দু'জনেরই স্কোয়াড থেকে বাদ পড়তে হলো। **প্রতিবেদন : জাকির হোসেন চৌধুরী**

নবারুণ

নিয়মিত পড়বে
লেখা ও মতামত পাঠাবে

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠান
email : nbdfp@yahoo.com

নবারুণ-এর বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা ।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ : dfpsb@yahoo.com ▪ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ▪ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd. No. Dha-476 Sachitra Bangladesh vol. 37, No. 6 December 2016, Tk. 25.00

বিজয় দিবসে জনতার উল্লাস

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা